কার্ল মার্কস :
জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা

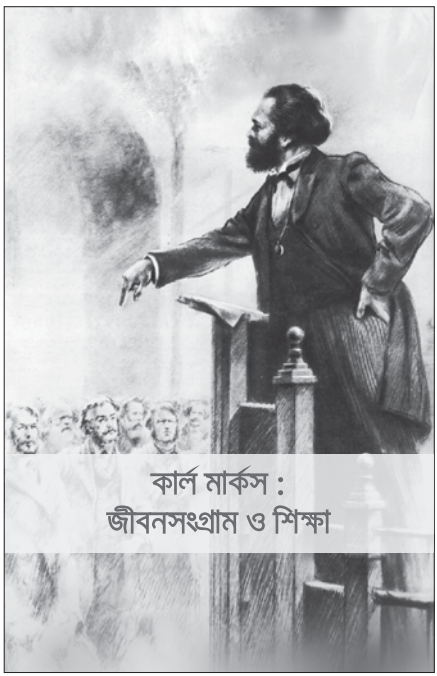

কার্ল মার্কস :
জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০১৭
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি
২২/১, তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা ১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৩৭৩
ই-মেইল : mail@spbm.org
ওয়েবসাইট : spbm.org

মূল্য: ১০ টাকা

ভূমিকা

সারা পৃথিবীর বিপ্লবকামী মানুষের মতো আমরাও নানা আয়োজনে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ পালন করছি। এরই অংশ হিসাবে আমরা স্মরণ করছি মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের উদ্‌গাতা, সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক মনীষী কার্ল মার্কসের জীবন ও শিক্ষাকে।

এই ছোট রচনায় মার্কসের জীবন ও সংগ্রামের বিরাট বিপুল অংশের সামান্যই তুলে ধরা সম্ভব। কিন্তু এ পুস্তিকা যদি পাঠকদের মধ্যে মার্কসবাদী দর্শন ও বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে এবং বিপ্লবী সংগ্রামে সামিল হতে অনুপ্রেরণা যোগায়, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

মার্কসের মৃত্যুর ১০৮তম বর্ষে ভারতের SUCI(C) দলের ইংরেজী মুখপত্র সাপ্তাহিক 'প্রলেতারিয়ান এরা'য় প্রকাশিত 'Life struggles and Teachings of Karl Marx and Frederick Engels'-কে ভিত্তি করে বর্তমান রচনাটি তৈরি করা হয়েছে। অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং সীমাবদ্ধতার দায়িত্ব আমাদের।

শুভেচ্ছান্তে
মুবিনুল হায়দার চৌধুরি
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

কার্ল মার্কস :
জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা

আমরা যারা মার্কসবাদী, নিজেদের মার্কসের অনুসারী বলে পরিচয় দেই – আমরা মার্কসের অনুসারী একারণে নই যে তিনি অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। কারণ মানব ইতিহাসে আরও অনেক অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা মার্কসবাদী এজন্য যে, একমাত্র মার্কসই আমাদের সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পথ দেখিয়ে গেছেন। এই পথ যে শুধুমাত্র পৃথিবীকে বদলে দেবে তা নয়, একইসাথে আমাদেরকেও একটি উচ্চতর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক স্তরে নিয়ে যাবে। মার্কস না হয়ে অন্য কেউ যদি এ কাজ করতেন, তবে আমরা তাঁরই অনুসারী হতাম।

মার্কসের যুগান্তকারী অবদানকে বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, মার্কসের আগে অন্যান্য দর্শনগুলো ছিল সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে সংযোগবিহীন। এই সমস্ত দর্শন শুধুমাত্র পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করেছে। আর যেহেতু এ সমস্ত দর্শনই ছিলো ব্যক্তির নিজ নিজ উপলব্ধি এবং কল্পনা থেকে সৃষ্ট – তাই এগুলো সবই মূলত ভাববাদী। মানুষের ইতিহাসে কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানান শাখা হতে বস্তুজগৎ এবং সমাজ-সম্পর্কিত যে বিশেষ জ্ঞানসমূহ অর্জিত হয়েছে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং জ্ঞানসমূহের একীভূতকরণ ও সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসেবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কসই প্রথম বস্তুজগৎ ও সমাজবিকাশের নিয়ম আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটান। এটি কেবল বস্তুজগৎ এবং ইতিহাসকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যাই করেনি, বরং প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক, বস্তুবাদী এবং ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় পৃথিবীকে পরিবর্তনের রূপরেখা প্রদান করেছে। আর একারণেই মার্কসবাদ কোনো বন্ধ্যা মতবাদ নয় – বরং কর্মের পথনির্দেশ, সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। মার্কসবাদের যথার্থ উপলব্ধি একজনকে করে তোলে সামগ্রিক ও নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ অনুধাবনে সক্ষম ও মুক্ত, শঙ্কাহীন সত্যিকারের মানুষ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বল দশা যে সকল প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে তার বিপরীতে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা বুঝতে হলে আমাদেরকে মার্কসের জীবন ও সংগ্রামকে উপলব্ধি করতে হবে, তাঁর অবদানের তাৎপর্য বুঝতে হবে। মার্কসের আবির্ভাব কোনো দুর্ঘটনা নয়, বা বিষয়টা এমনও নয় যে, দর্শনশাস্ত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর দায়িত্ব দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। মার্কসের গোটা জীবনকে ব্যাপ্ত করে পরিচালিত সংগ্রামের ফল এই মার্কসবাদী দর্শন। এই সংগ্রাম বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তিগত ও একক কোনো সংগ্রাম নয়। একে বরং বলা যায়, সমাজের মৌলিক প্রয়োজন এবং সামাজিক চাহিদাকে সুসংহত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সচেতন সংগ্রাম।

মার্কসবাদের বিকাশ তখনই সম্ভব হয়েছিলো যখন এর প্রয়োজনীয় সমস্ত পারিপার্শ্বিক সামাজিক শর্তগুলো পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ যখন বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক অগ্রগতি, পুঁজিবাদের বিকাশ, সর্বহারাশ্রেণির উন্মেষ এবং সমাজে বুর্জোয়াদের সাথে সর্বহারাদের বিরোধ প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো। মার্কস যখন 'ক্যাপিটাল' লেখেন, সেটা কি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির একক চিন্তার প্রকাশ ছিলো? বিষয়টি একেবারেই সেরকম নয়। এটি ছিলো একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তার সর্বোত্তম ব্যক্তিকৃত প্রকাশ। তৎকালীন সময় এবং সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসের মধ্যে যে দ্বন্দ্বসমূহ ক্রিয়াশীল ছিল, তা একদিকে ছিল সমাজের পূর্ববর্তী সর্বোন্নত সামাজিক চিন্তাগুলোর সংকলন, তার ধারাবাহিকতা – আবার পাশাপাশি তার সঙ্গে একটি ছেদও। এই ছেদের মধ্য দিয়েই সর্বহারাশ্রেণি এবং জনগণের সচেতন সংগ্রামের পথনির্দেশক একটি সামগ্রিক একীভূত বিপ্লবী দর্শনের জন্ম হয়েছিলো। তাই সত্যিকার অর্থেই মার্কস ছিলেন নবযুগের অগ্রদূত।

মার্কস এবং তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধু এঙ্গেলস মানব জ্ঞানভাণ্ডারে যে অবদান রেখেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে লেনিন মার্কসবাদকে আরও সুসংহত, বিস্তৃত এবং উন্নত করেন। তারও পরে স্ট্যালিনও একই কাজ করেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কাজের উপর দাঁড়িয়ে এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। তবে সত্য এই যে, কার্ল মার্কস ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একজন যুগস্রষ্টা।

মার্কসবাদের আবির্ভাব

মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে মার্কসের অবদান সম্পর্কে এককথায় কী বলা যায়? লেনিনের ভাষায়:
"মার্কস হলেন সেই প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি উনিশ শতকের প্রধান তিনটি আদর্শিক ধারাকে বিকশিত এবং পরিপূর্ণ করেন। এই ধারা তিনটি মানব সভ্যতার তৎকালীন সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলো। এগুলো হলো: জার্মান চিরায়ত দর্শন, ইংল্যান্ডের চিরায়ত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসি বিপ্লববাদী ধারাকেন্দ্রিক ফরাসি সমাজতন্ত্র।"[১]

দর্শনের জগতে সে সময় জার্মান দার্শনিক হেগেলের (গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল, ২৭ আগস্ট ১৭৭০ - ১৪ নভেম্বর ১৮৩১) চিন্তা একক আধিপত্য নিয়ে অবস্থান করছিলো। পুরাতন অপরাপর ভাববাদী দর্শনের সাথে হেগেলের চিন্তার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিলো। হেগেল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি আবিষ্কার করে দেখালেন যে জগতের সকল পরিবর্তন এবং বিকাশ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে ঘটে – অর্থাৎ বিপরীতের সমন্বয় কাজ করে। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও হেগেল শেষ পর্যন্ত ভাববাদী দর্শনের কাঠামো থেকে বের হতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্বতত্ত্ব, প্রকৃতি এবং বিশ্বজগৎ হয়ে গেল 'পরম সত্ত্বার' প্রকাশ মাত্র!

হেগেলের বামপন্থী ধারার এক তরুণ শিষ্য ফুয়েরবাখ (লুদভিগ আন্দ্রিয়েস ফুয়েরবাখ,২৮ জুলাই ১৮০৪ - ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭২), হেগেলের দর্শনের ভাববাদী দিকটা উন্মোচন করে বস্তুবাদকে সামনে আনেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে ফুয়েরবাখ আবার দ্বন্দ্বতত্ত্বকেই অস্বীকার করে বসলেন, যদিও হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিশ্চিতভাবেই অপরাপর অন্য সব দর্শনের চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর ছিলো। ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ পূর্ববর্তী সকল যান্ত্রিক বস্তুবাদকে বাতিল করে দিলেও শেষ বিচারে এটিও আবার ভাববাদ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারলো না, কারণ ফুয়েরবাখ নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধকে অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। স্ট্যালিনের ভাষায়, মার্কস এবং এঙ্গেলস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে এর 'যৌক্তিক কাঠামো' নিয়েছেন এবং ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ থেকে এর 'প্রাণসত্ত্বা' নিয়েছেন যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১. *Lenin's CollectedWorks,Moscow, 1974, Volume21, pp. 43-91. Progress Publishers. First Published: 1915 in the Granat Encyclopaedia, Seventh Edition, Vol. 28, over the signature of V. Ilyin.*

শিল্পায়নের দিক থেকে সে সময়ে ইংল্যান্ড ছিলো সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, পেটি, রিকার্ডো – এদের হাতেই চিরায়ত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল। তাদের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু তা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে তার পরবর্তী পর্যায় পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেনি।

এদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপরীত্য, অবিচার আর অসাম্য – এসবই সমাজ অভ্যন্তরে নতুন ধরনের চেতনার জন্ম দিচ্ছিল – সমাজতান্ত্রিক চেতনা। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার নানান ধারাও সেসময় দেখা যাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ফরাসি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা। তারা মনে করতো যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব, কিন্তু কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। সমস্তরকম আন্তরিকতা সত্ত্বেও, তাদের সমাজতন্ত্র ছিলো কল্পনার স্বর্গরাজ্য – বাস্তবে একটি অবৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা। মানুষের সামনে তখন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে উপস্থিত ছিলো ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা – তার নাম 'ফরাসী বিপ্লব' । ফরাসি বিপ্লব দেখিয়েছিলো মানুষের যুক্তি, চিন্তা এবং সংঘবদ্ধ ও সচেতন কর্মপ্রয়াস কিভাবে বিরাজমান বাস্তবতার উপর ক্রিয়া করে সামাজিক কাঠামোকে বদলে দিতে পারে।

কার্ল মার্কস এই আদর্শিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আবার এর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাসমূহ উন্মোচিত করেন, সেগুলোকে অতিক্রম করেন এবং এর সাথে ছেদ ঘটিয়ে এগিয়ে যান এক নতুন ক্ষেত্রে। জীবনভর সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রকে আয়ত্ত করেন। শোষিতের হয়ে শোষণের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে লড়ে লড়ে যুগের প্রয়োজনেই তিনি একটি সামগ্রিক বিজ্ঞান ও কর্মের পথনির্দেশক হিসেবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদের কাঠামো গড়ে তোলেন।

মার্কসের ঐতিহাসিক অবদান

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করাতে গিয়ে মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তার ভাববাদী খোলস থেকে মুক্ত করেন। একই সাথে তিনি অতিক্রম করেন ফুয়েরবাখের সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতিগুলোও। মার্কসের ভাষায়, "আমার দ্বন্দ্বতত্ত্ব হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে যে শুধু আলাদাই তা নয়, বরং সোজা বিপরীত। হেগেলের মতে, মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি, বিশেষত চিন্তাপদ্ধতি, যাকে তিনি 'ভাবনা' নামক একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে হাজির করেন – সেটাই হলো বাস্তব দুনিয়ার স্রষ্টা। আর বাস্তব দুনিয়া হলো এই ভাবনার বিস্ময়কর বাহ্যিক কাঠামোমাত্র। অন্যদিকে আমার মতে, ভাবনা মানবমস্তিষ্কে বাস্তব দুনিয়ার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়, যা চিন্তার আকারে প্রকাশিত হয়।"[২]

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলকথা হলো – প্রকৃতির কোনো কিছুই বা কোনো ঘটনাই স্থিতিশীল নয়, বরং দুটো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সংঘাতপূর্ণ সহাবস্থান হিসেবে এরা বিরাজ করে। এটি হলো দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব, থিসিস এবং এন্টিথিসিস, যা বিকাশ এবং পরিবর্তনের উৎস। কোনো কিছুর অভ্যন্তরে বিপরীতের এই দ্বন্দ্ব বাড়তে বাড়তে যখন চরম অবস্থায় পৌঁছায় তখন দুই বিপরীত আর একসাথে থাকতে পারে না। এর ফলে একটা নতুন জিনিস সৃষ্টি হয় – যাকে বলে সিনথিসিস, যা পুরনোকে নিঃশেষ করে আসে। কিন্তু পুরনোকে নিঃশেষ করে নতুন যা আসে তার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকে নিজেকে ধ্বংস করবার বীজ। কারণ সে বহন করে আনে নতুন দ্বন্দ্ব অর্থাৎ নতুন থিসিস ও নতুন এন্টিথিসিস, যা পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি করবে নতুন সিনথিসিস, অর্থাৎ নিজের অবলুপ্তি। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

২. *Dialectical and Historical Materialism: J. V. Stalin; First published September 1938.*

বিষয়টি কোনো একজন দার্শনিক ভেবে ভেবে বের করেছেন এমন নয় বরং মহাবিশ্বের যে কোনও কিছু এবং সবকিছুর পরিবর্তনের নিয়ম এটাই। এই সাধারণ সত্য কোনো ব্যক্তির মনমতো এবং মনগড়া বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে আসেনি। মার্কস সমকালীন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমন্বয় এবং সংযুক্তি সাধনের মাধ্যমেই এটি আবিষ্কার করেছেন।

মার্কস দেখালেন যে প্রকৃতির মতোই সমাজ এবং ইতিহাসও দ্বন্দ্বের নিয়মে পরিচালিত। এ পর্যন্ত অবস্থিত সকল সমাজের ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, যা সমাজ অভ্যন্তরের সংঘাতের প্রতিফলন। অভ্যন্তরে বিপরীতের এই সংঘাতের মীমাংসার মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে, পুরোন সমাজ ভেঙে গিয়ে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। মার্কস প্রথম দিকের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একপাশে রেখে, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও এর বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্তির আলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে ও নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখালেন যে, বুর্জোয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তা অমীমাংসেয়। একারণেই ধনতন্ত্রকে নিঃশেষ করে এর ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই ব্যবস্থার পুঁজি এবং শ্রমের দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয় দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা যায়। এটিই বাস্তবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব। এ থেকে সমাজ অগ্রসর হতে পারে শুধু এই দ্বন্দ্বের নিরসনের মাধ্যমে, যা ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কেবল সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই হতে পারে। সমাজতন্ত্র হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে শ্রেণিহীন সমাজে যাবার একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এই মধ্যবর্তী অবস্থায় রাষ্ট্র হলো সর্বহারার একনায়কত্ব মাত্র।

মার্কস এই ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাকে সন্নিবেশিত করে বলেন, "আধুনিক সমাজে শ্রেণি আবিষ্কার বা এদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আবিষ্কার – এ দুটোর কোনোটারই কৃতিত্ব আমার নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ইতিহাসবিদেরা শ্রেণিগুলোর সংঘর্ষের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা করেছেন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা এদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন। আমি নতুন যা করেছি তা হলো, প্রমাণ করেছি যে: (১) উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের একটি সুর্নিদিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের সাথেই কেবলশ্রেণিগুলোর অস্তিত্ব জড়িত, (২) শ্রেণিসংগ্রাম অপরিহার্যভাবে সর্বহারার একনায়কত্বের দিকে পরিচালিত হয়, এবং (৩) কেবল এই একনায়কত্বই সকল শ্রেণির অবসান ঘটিয়ে একটি শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।"[৩]

কার্ল মার্কস সমগ্র জীবনভর তিলে তিলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। মানবজাতির সামনে রেখে গেছেন একটি সামগ্রিক বিশ্বদর্শন যা প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মের দিকনির্দেশনা দেয়। কেউ যদি তাঁর এই বিশাল অবদানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই মার্কসের জীবনসংগ্রামটা বুঝতে হবে।

বেড়ে ওঠার কাল

মার্কস-এর জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ মে, প্রুশিয়ার (একীভূত রাষ্ট্র হিসেবে তখন পর্যন্ত জার্মানি গঠিত হয়নি, প্রুশিয়া তখন একটি আলাদা রাজ্য) রাইন প্রদেশের ট্রিয়ের শহরে। পশ্চিম ইউরোপে তখন বুর্জোয়া উন্মেষের সময়। যদিও ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানিতে এই উন্নতি অনেক দেরিতে শুরু হয়েছিল।

পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণির আবির্ভাবের সাথে সাথে সর্বহারাশ্রেণিও তাদের দৈন্য এবং দুর্দশা নিয়ে আবির্ভূত হয়। নানান ধারার পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা সে সময় ক্রিয়াশীল ছিলো। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সেইন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ। ধর্মীয় অনুশাসন

৩. *Marx's letter to Weydemeyer dated March 5, 1852.*

ও দর্শনসহ সমস্ত কিছুকেই প্রশ্ন করা ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখার একটি পরিবেশ তখন ছিলো। সেসময় ফুয়েরবাখ হেগেলীয় দর্শনের আধিভৌতিক রহস্যবাদিতার মুখোশ উন্মোচন করে এই মত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ঈশ্বর মানুষের সৃষ্ট, মানুষের কল্পনার ফসল মাত্র। তার ফলে এই চিন্তার ভিত্তি তৈরি হলো যে, মানুষ যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে তাহলে সে নিজের ভালোর জন্য নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনেরও ক্ষমতা রাখে। ফলে, অনেক তরুণ হেগেলিয়ানই বিমূর্ত দর্শনচর্চা এড়িয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করেন। *[সে সময় যেসব ছাত্র-যুবক এবং তরুণ-বুদ্ধিজীবী হেগেলকে অনুসরণ করতেন তাদের বলা হত ইয়াং হেগেলিয়ান বা তরুণ হেগেলিয়ান।]*

হেগেল দ্বারা প্রভাবিত একজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী *(Radical democrat)* হিসেবে মার্কসের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৮৪২ সালে তিনি যুক্ত হন রাইন সংবাদ *(Rheinische Zeitung)* পত্রিকার সাথে। পরবর্তীতে এর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। মার্কস তাঁর লেখায় তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা ও প্রশ্নসমূহকে তুলে ধরেন, বাস্তবতার কষ্টিপাথরে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তিগুলোকে যাচাই করেন, সেগুলোকে তীক্ষ্ণ ও উন্নত করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ করেন, হেগেলিয়ান দর্শন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে এবং বস্তুগত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার দিকনির্দেশনা দিতে পারছে না। ইউরোপে সেসময়ে পুঁজিপতিশ্রেণি এবং সর্বহারাদের মধ্যকার যে তীব্র বিরোধ ও সংগ্রাম ক্রমেই বিকশিত হচ্ছিলো, তার আলোকে তিনি আরও লক্ষ করেন যে, এক্ষেত্রে কোনদিকে অবস্থান নেয়া উচিত – এ ব্যাপারেও হেগেলিয়ান পদ্ধতির মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পথ নেই। তার উপর ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের মতাদর্শকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার মতো পড়াশোনা বা জানাবোঝা সে সময়ে তাঁর ছিল না। মার্কস বুঝতে পারলেন – সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্টবিজ্ঞান এবং রাজনীতি নিয়ে তাঁর আরও গভীর পড়াশোনা দরকার।

রাইন সংবাদ-এর বিপ্লববাদী প্রবন্ধগুলো প্রুশিয়ান সরকারের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো। ১৮৪৩ সালে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে দমনমূলক নির্দেশনা জারি করা হলো। মার্কসকে বলা হলো প্রবন্ধগুলোকে সরকারের জন্য সহনীয় করতে। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এরপর এক মাস ধরে তিনি নিজেকে কঠোর অধ্যয়নে নিয়োজিত রাখলেন। ফলাফল হিসেবে লিখলেন 'অধিকার বিষয়ে হেগেলীয় দর্শনের পর্যালোচনা' *(Critique of the Hegelian philosophy of the Right)*। এই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে হেগেলিয়ান দর্শনের বিপরীতে গণতন্ত্র, শ্রেণি, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বিলোপের ব্যাপারে মার্কসের ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে দেখা যায়। যদিও এ লেখা মার্কসের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হতে পারেনি।

প্যারিসে

মার্কস একটি বিপ্লবী সাময়িকপত্র *(Radical Journal)* প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন যা দেশের বাইরে ছাপিয়ে গোপনে জার্মানিতে পাঠানো হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালের অক্টোবরে তিনি প্যারিসে যান। সে সময়ে প্যারিস ছিলো গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক এবং একই সাথে সমকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বস্তুত ১৮৪০-এর দশকে প্যারিস ছিল ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্যারিসে সেসময়ে নানা ধরনের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শক্তি কাজ করতো। বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী গোপন সংগঠনের অস্তিত্ব ছিলো। গণপ্রজাতন্ত্রীদের *(Republicanism)* জঙ্গী ধারা তখন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। বিভিন্ন ধরনের সংঘ ও দল সক্রিয় ছিলো, যার মধ্যে 'প্রবাসী জার্মান লীগ'ও ছিলো। ফলে বহু ধারার বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় প্যারিস ছিলো উত্তপ্ত। নানান ধারার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে

পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ-র *(Pierre-Joseph Proudhon, ১৫ জানুয়ারি ১৮০৯ - ১৯ জানুয়ারি ১৮৬৫)* নেতৃত্বাধীন ধারাটিই ছিলো সবচেয়ে প্রভাবশালী।

মার্কস সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু একই সাথে নিজেকে সার্বিকভাবে নিয়োজিত করলেন সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিষয়ক পড়াশোনায়। তিনি শ্রমিকদের জীবন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন, ফরাসি এবং জার্মান গুপ্ত সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ তৈরি করেছেন, প্রুধোঁসহ অন্যান্য ফরাসি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন। সেসময় হেনরিখ হাইনের (*Christian Johann Heinrich Heine*, ১৩ ডিসেম্বর ১৭৯৭ - ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬) সাথে তাঁর বন্ধুত্বের শুরু হয়। এছাড়া রুশ বিপ্লবী বাকুনিন ও বোটকিন-এর সাথে তিনি পরিচিত হন। এ সময় তিনি পাঠ করেন এডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদসহ ফুরিয়ের, সাইমন, ওয়েন প্রমুখ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের লেখা। পাশাপাশি ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কেও বিস্তারিত পড়াশোনা করেন।

মার্কস এবং আর্নল্ড রুগে (*Arnold Ruge*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮০২ - ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮০)-র যৌথ সম্পাদনায় "জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী" *(Deutsch-Französische Jahrbücher)* নামে একটি সাময়িকপত্র প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সংখ্যার পরই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ রুগে মার্কসের প্রগতিশীল বিপ্লবী চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন। মার্কসের দুটো রচনা 'ইহুদি প্রশ্নে' *(On the Jewish Question)* এবং 'অধিকার সম্পর্কে হেগেলীয় দর্শন-এর পর্যালোচনার ভূমিকা' *(Introduction to a Critique of Hegel's Philosophy of the Right)* এই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। লেখা দুটিতে আমরা হেগেলের আদর্শবাদের সাথে মার্কসের দর্শনের পার্থক্য পরিষ্কার দেখতে পাই। বিশেষত দ্বিতীয় লেখাতে প্রথমবারের মতো সর্বহারাদের বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ঐতিহাসিক ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং বিপ্লবকে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। মার্কস দেখালেন, যে ধারাটি সে সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ধর্মের সমালোচনা করতো তারা ছিলো উদ্দেশ্যহীন। তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রগতিশীল দর্শনের সত্যিকারের কাজ হবে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে, ধর্মকে প্রতিপালন করে যে শর্তগুলো তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। তিনি ঘোষণা করেন : "স্বর্গের সমালোচনা পর্যবসিত হোক পৃথিবীর সমালোচনায়, ধর্মের সমালোচনা পর্যবসিত হোক আইনের সমালোচনায় এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনা পর্যবসিত হোক রাজনৈতিক সমালোচনায় ..." [৪]

এঙ্গেলসের সাথে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং মার্কসের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৮৪২ সালের নভেম্বরে, জার্মানির কোলনে। এঙ্গেলস রাইন সংবাদ অফিসে গিয়েছিলেন। সেবারের সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরকে জানা-বোঝার সুযোগ পাননি। এরপর 'জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী'র প্রকাশিত একমাত্র সংখ্যাতে এঙ্গেলস 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার রূপরেখা' *(Critical Sketcheson Political Economy)* নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৪৪ সালের আগস্টে এঙ্গেলস যখন প্যারিসে আসেন, সেখানেই মার্কসের সাথে তাঁর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হয়। এটা ছিলো মার্কস-এঙ্গেলসের দীর্ঘ বন্ধুত্ব এবং যৌথ সংগ্রামের সূচনা যা একদিন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই এঙ্গেলস সুগভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সর্বহারাদের জীবনযাত্রার অবস্থা তাঁর প্রবন্ধ 'ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা' *(The Condition of the Working Class in England)*-এ তুলে ধরেছেন।

তাঁরা দুজন আবিষ্কার করলেন যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং আলাদা আলাদাভাবে কাজ করেও তারা

৪. *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right.*

একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এরপর তারা একত্রে লিখতে আরম্ভ করেন "পবিত্র পরিবার" *(The Holy Family)*। পরবর্তীতে এর বেশিরভাগ অংশ মার্কস লিখে লেখাটি সমাপ্ত করেন এবং এটি ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়।

এই সময় মার্কস চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। একই সাথে আবার প্রুশিয়ান সরকারের চাপের মুখে তাঁকে প্যারিসও ছাড়তে হয়। ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্যারিস থেকে ব্রাসেলস্-এ যান। প্রুশিয়ান সরকার তাকে বহিষ্কারের দাবি করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি প্রুশিয়ান নাগরিকত্বও ত্যাগ করেন।

মার্কসবাদের বিকাশ

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী এবং তরুণ হেগেলিয়ান – এই দুইধারার সাথেই সাধারণ মূলনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের পার্থক্য মার্কস-এঙ্গেলস তুলে ধরেন 'পবিত্র পরিবার' *(The Holy Family)* বইটিতে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা মনে করতো যে সর্বহারারা হলো একটা অসহায় দুর্ভাগা জনগোষ্ঠী যাদের জন্য সমাজতন্ত্র একটি উপহারের মতো। এমনকি অনেক তরুণ হেগেলিয়ানও গণসংযোগ এবং গণআন্দোলন পছন্দ করতেন না। তারা মনে করতেন, কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি বা অভিজাত সম্প্রদায়ই একমাত্র ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন যে এই দুই ভাবনার কোনোটিই সঠিক নয়। বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র তখনই যখন সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় সর্বহারারা আত্মসচেতন শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসেবে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবে।এই লেখার নানান ছত্রে সুস্পষ্টভাবে আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূচনা দেখতে পাই। যেমন: "প্রশ্ন এটা নয় যে, একজন সর্বহারা, এমনকি সমস্ত সর্বহারা শ্রেণি এই মুহূর্তে লক্ষ্য কী বলে মনে করে। প্রশ্ন হলো সর্বহারাশ্রেণি কী এবং এই কারণে ঐতিহাসিকভাবেই সে কী করতে বাধ্য। সমসাময়িক সামগ্রিক সমাজকাঠামো ও বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা এর লক্ষ্য এবং কার্যাবলী ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত, চূড়ান্ত এবং সুস্পষ্ট।"[৫]

এর আগে, তাঁর প্যারিসের পাণ্ডুলিপিতে মার্কস সংক্ষিপ্ত আকারে, সুস্পষ্টভাবে বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং সাম্যবাদের মধ্যেকার পার্থক্য দেখান: "...কমিউনিজম হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবতাবাদ।"[৬] কমিউনিজম হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বিবর্জিত মানবতাবাদ – এই চিন্তার মাধ্যমে মার্কসের সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা পরিষ্কারভাবে মানবতাবাদ এবং কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। সুস্পষ্টভাবে দেখায় যে, তৎকালীন সময়ে যতই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করুক না কেন, মানবতাবাদ পুঁজি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। অপরদিকে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে পুঁজি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মজুরি দাসত্বের অবসানের মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজ নির্মাণের দিকে অগ্রসর হবার লক্ষ্য নিয়ে।

দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত করার কাজ দ্রুত এগোতে থাকে। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই লেখা হয় 'ফুয়েরবাখ বিষয়ক থিসিস' *(The Theses on Feuerbach; 1845)*, 'দর্শনের দারিদ্র্য' *(The Poverty of Philosophy; 1847)* এবং 'জার্মান ভাবাদর্শ' *(The German Ideology; 1846)*। প্রথম দুটি মার্কসের একক রচনা, আর শেষোক্তটি মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ রচনা।

এই লেখাগুলোতে দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বায়িত করতে গিয়ে মার্কস ফুয়েরবাখের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করেন। বিশেষত তিনি ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ সম্পর্কিত যান্ত্রিক এবং

৫. *The Holy Family: Chapter 4: 4 Proudhon (by Marx): Critical Comment No. 2*
৬. *Karl Marx's Economic and Philosophical Manuscripts: Third Manuscript: Private Property and Labor: Critique of Hegel's Dialectic and General Philosophy.*

আধিভৌতিক ধারণাকে তুলে ধরেন। দার্শনিকদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, "... দার্শনিকরা শুধুমাত্র নানানভাবে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করে গেছেন, যদিও আসল কাজ হলো একে বদলানো।"[৭]

'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে প্রথমবারের মতো আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুনির্দিষ্ট কাঠামো পাই। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোকে তাঁরা দেখালেন যে, "...সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যারা একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপাদনে সক্রিয়, তারা একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করে। সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সামাজিক কাঠামো এবং রাষ্ট্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু এসব ব্যক্তি নিজেরা অথবা অন্যরা যেভাবে কল্পনা করে সেভাবে তা পরিবর্তিত হয় না। বরং পরিবর্তন ঘটে তারা যা সেই হিসেবেই অর্থাৎ তারা যে কাজ করে, বস্তুগতভাবে যা উৎপাদন করে, যে সুনির্দিষ্ট বাস্তব সীমাবদ্ধতার মধ্যে ক্রিয়া করে, যা তাদের বিশ্বাস এবং চিন্তানিরপেক্ষভাবে বিরাজ করে, সেভাবেই ..." তিনি বলেন, "রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সকল সংগ্রাম – গণতন্ত্র বনাম অভিজাততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সংগ্রাম, অধিকারের জন্য সংগ্রাম ইত্যাদি আর কিছুই নয়, বিভিন্ন শ্রেণিগুলোর মধ্যকার সংগ্রামের একটা নকল প্রতিরূপমাত্র।" দেখান যে, "... সর্বহারাদের আয়ত্বে আসবার পরই উৎপাদনের যন্ত্র ব্যক্তির প্রতি অনুগত হয় এবং সবার সম্পদে পরিণত হয়। ব্যক্তির পক্ষে আধুনিক সার্বজনীন পারস্পরিক বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করবার একমাত্র উপায় হলো একে সবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। ...সাম্যবাদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয় যা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সাম্যবাদ এমন কোনো আদর্শ নয় যার সাথে বাস্তবতা নিজেকে মিলিয়ে চলবে। আমরা সাম্যবাদ কেবলি সত্যিকারের আন্দোলন যা বর্তমান অবস্থাকে অবলুপ্ত করবে। এই আন্দোলনের ফলাফল প্রস্তাবনা থেকে এখন বাস্তবতায় চলে এসেছে।"[৮]

মার্কস ভাববাদী এবং কাল্পনিক আদর্শবাদীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সর্বহারাশ্রেণির বৈজ্ঞানিক এবং সমন্বিত বিশ্বদর্শন হিসেবে বিকশিত করেছেন। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হল প্রুঁধোর 'দারিদ্রের দর্শন' *(Philosophy of Poverty)*। মার্কস তখন কলম তুলে নিলেন, প্রুঁধোর বিভ্রান্ত আদর্শবাদ ও সংকীর্ণ সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জাল ছিন্ন করলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সঠিক বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাশিয়ান সাংবাদিক আন্নেনকোভকে লেখা এক চিঠিতে মার্কস প্রুঁধোর কিছু সমালোচনা করেন এবং সঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। এর এক শিক্ষণীয় ছত্রে লেখা: " মানুষ কি স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো সামাজিক কাঠামো বেছে নিতে পারে? কোনোভাবেই না। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে আমরা ভোগ এবং আদান-প্রদানের একটি নির্দিষ্ট রূপ পাই। উৎপাদন, আদান-প্রদান এবং ভোগের বিকাশের যে কোনো একটা স্তর ধরে নিলে, এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক কাঠামো, সঙ্গতিপূর্ণ পারিবারিক, সামাজিক স্তর বা শ্রেণীগুলোর সংগঠন পাওয়া যাবে, এক কথায় বলতে গেলে সঙ্গতিপূর্ণ সুশীল সমাজ পাওয়া যাবে।"[৯] পরবর্তীতে একই সালে (১৮৪৭) প্রুঁধোর লেখার জবাবে লিখিত তাঁর বই 'দর্শনের দারিদ্র্য' *(The poverty of Philosophy)*-তে নিজস্ব এই ভাবনাগুলো আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন : "একজন ব্যক্তি বস্তুগত উৎপাদনের সাথে প্রথা অনুযায়ী যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, সে একই সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলোর বিন্যাস অনুযায়ী মানানসই নিয়মনীতি, আদর্শ তৈরি করে। ফলে এই চিন্তা, এই বিন্যাস – যে সম্পর্কগুলো সে প্রকাশ করে তার চেয়ে বেশিস্থায়ী নয়। এগুলো সবই ঐতিহাসিক এবং ক্ষণস্থায়ী ফলাফল মাত্র।"

৭. *Theses On Feuerbach: Karl Marx 1845*

৮. *The German Ideology: Karl Marx 1845*

৯. *Letter from Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov, Written: December 28, 1846.*

সক্রিয় রাজনীতিতে

সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রস্তুত। এখন একে দিকনির্দেশক আদর্শ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সময়। মার্কস এবং এঙ্গেলস ইতোমধ্যেই জার্মানির সংগঠিত শ্রমিকদের সাথে বেশ কিছু যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন এবং ব্রাসেল্‌সে জার্মান শ্রমিকদের সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও শ্রমিকদের একটা বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৪৬ সালে তাঁরা ব্রাসেল্‌সে 'কমিউনিস্ট পত্র-যোগাযোগ কমিটি' *(Communist Correspondence Committee)* প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে 'জাতীয়তার সীমাবদ্ধতা ঝেড়ে ফেলার' ধারণাকে বিকশিত করেন। এই কমিটি তার বৈঠকগুলোতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো যা তখন পর্যন্ত একদম প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয় ছিলো। এই কমিটি বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা এবং যোগাযোগ রক্ষা করতো।

মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্যেগের ফলেই এ ধরনের নানান কমিটি ও গ্রুপ জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে প্যারিস ও লন্ডনে গড়ে ওঠে। কমিটির পক্ষ থেকে কয়েক বছর ধরে শ্রমিক এবং সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দসহ নানান দেশের সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার্কুলার বিলি করা হতো। ঐ বিশেষ অবস্থায় মার্কস এবং এঙ্গেলস শ্রমিকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন এই বলে যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের উচিত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার দাবির আন্দোলনে বুর্জোয়াদের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা, যার মাধ্যমে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সহায়ক ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে।

যেখানে থেকেই কাজ করুন না কেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মার্কস বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতেন ও যোগাযোগ রাখতেন। অল্পকিছু সময়ের জন্য মার্কস এবং এঙ্গেলস 'লীগ'-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৩৬ সালে, নির্বাসিত জার্মানরা প্যারিসে'লীগ অফ দি জাস্ট' (ন্যায় বিচার সংঘ) নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। এর প্রকাশ্য আইনসিদ্ধ সহায়ক সংগঠন হিসেবে ১৮৪০ সালে 'জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা সমিতি' *(German Worker's Educational Association)* প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 'লীগ' অথবা 'এসোসিয়েশন'-এর শাখা তৈরি হয়। আর এই প্রক্রিয়ায় জার্মান-ভিত্তিক সংগঠন থেকে 'লীগ' একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে বিকশিত হয়।

শুরুর দিকে লীগের কাজের চরিত্র ছিল চক্রান্তমূলক। সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ভ্রান্ত ধারণা এবং চক্রান্তমূলক কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা 'লীগ'-এর সদস্যরা যত দিন যাচ্ছিল তত তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস লীগে যোগ দিলেন। ১৮৪৭ সালে লন্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় যেখানে 'লীগ' নিজেদের পরিচয় দেয় 'কমিউনিস্ট লীগ' হিসেবে এবং তারপর থেকে তারা এই পরিচয়েই পরিচিত হয়। এঙ্গেলস এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আর এই বছরেই দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্কস এবং এঙ্গেলস দু'জনই যোগ দিয়েছিলেন, মার্কস এখানেই তার সর্বহারা বিপ্লবের নতুন তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই নতুন আদর্শিক ভিত্তি সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হলো এবং মার্কস-এঙ্গেলসকে 'লীগ'-এর পক্ষ থেকে একটা ঘোষণাপত্র তৈরির দায়িত্ব দেয়া হলো। এরই ফলাফল হলো 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'। 'সকল মানুষ ভাই ভাই' – এই পুরনো ঘোষণা বদলে এলো নতুন ঘোষণা – 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!'

মার্কস-এঙ্গেলসের এই উদাত্ত আহবান পুরো পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠার জন্য

বিরাট সহায়তাই শুধু করেনি, বরং একইসাথে এই ঘোষণা একটা উন্নত আদর্শ এবং উচ্চতর সর্বহারা সংস্কৃতি ও নীতি নৈতিকতাকেও তুলে ধরেছে, যা নিজ নিজ আঞ্চলিক সীমানার সংকীর্ণ ধারণাকে অতিক্রম করে সকল দেশের সর্বহারাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সম্পর্কিত একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটায়।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে জনগণের শাসন বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু হয়। একে 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় লন্ডন 'লীগ'-এর কেন্দ্রিয় কমিটি নিজে থেকেই ভেঙে যায়। এটি মার্কসকে প্যারিসে নতুন একটা কেন্দ্রিয় কমিটি তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। কিন্তু এরপরই পুলিস মার্কসকে গ্রেফতার করে ফ্রান্স ত্যাগে বাধ্য করে। প্যারিসে তৈরি হওয়া নতুন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যরা 'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দাবিনামা' *(Demands of the Communist party in Germany)* নামক একটা দলিল তৈরি করেন। এটা পুরো জার্মানি জুড়ে বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্যারিস অভ্যুত্থানের পরাজয় (১৩ জুন ১৮৪৯), জার্মানিতে মে বিদ্রোহের ব্যর্থতা এবং জারের রাশিয়া হাঙ্গেরির বিপ্লব দমন করার পর, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলো ফুরিয়ে আসে। নির্বাসনে থাকা 'লীগ'-এর বেশিরভাগ সদস্য নিজ দেশে ফিরে যান। 'লীগ'-এর সাথে তাদের যোগাযোগেরও ছেদ ঘটে। সেসময়ে প্রতিটি দেশের, এমনকি প্রদেশ বা শহরের পরিস্থিতিও এত ভিন্ন ভিন্ন ছিলো যে এরকম পরিস্থিতিতে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেবার ক্ষমতা 'লীগ'-এর নেই।

পরবর্তীতে ১৮৫০ সালে 'লীগ' নতুন করে সংগঠিত হয়েছিল। যদিও ১৮৪৭ সালের যে শিল্পসংকট ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল, তা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। অভূতপূর্ব শিল্পায়নের একটা নতুন যুগ শুরু হলো। 'লীগ' বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শেখার চমৎকার জায়গা হলেও নতুন করে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কোনো সুযোগ আর তখন ছিল না। মার্কস এবং এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন :"এই সাধারণ উন্নয়নের ধারায়, যেখানে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে যতখানি সম্ভব ততখানি উন্মুক্তভাবে বিকশিত হচ্ছে সেখানে বিপ্লবের কোনো বাস্তবতা বিরাজ করে না।"[১০] পরিস্থিতির এই যথার্থ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন এবং বিপ্লব নিয়ে ছেলেমানুষী না করার এই সতর্কতামধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা (রোমান্টিসিজম) এবং দুঃসাহসিকতার ঝুঁকি (অ্যাডভেঞ্চারিজম) দ্বারা আক্রান্ত 'লীগ'-এর বিশাল সংখ্যক সদস্যের মনঃপুত হয়নি। 'লীগ'-এর মধ্যে ভাঙন দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫২ সালে তা বিলুপ্ত হয়।

কমিউনিস্ট ইশতেহার

কমিউনিস্ট ইশতেহার ছিলো প্রথম কর্মসূচিভিত্তিক দলিল, যেখানে প্রথমবারের মতো মার্কসীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লবী তত্ত্ব এবং চর্চার দিকগুলো একসাথে, সংক্ষিপ্ত আকারে, গুছিয়ে হাজির করা হয়। এই ইশতেহার সমাজবিকাশের ধারা অনুসরণ করে ইতিহাসের গতিপথে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং এর বিকল্প হিসেবে সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাকে নির্দেশ করে, সাম্যবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের বিরোধ এবং কুৎসা প্রত্যাখ্যান করে, সাম্যবাদী বিপ্লবের রূপরেখা নির্ধারণ করে, বিপ্লবের পরবর্তী এবং ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ করে, নানাধারার পেটি-বুর্জোয়া ও কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্দিষ্ট সমালোচনা হাজির করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিপরীতে সাম্যবাদীদের কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে। পুরো কাজটিই ছিলো উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর – বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস পরিক্রমাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে উপস্থাপন।

১০. *Chapter IV of 'The Class Struggles in France', Karl Marx and Frederick Engels in Neue Rheinische Zeitung Revue, Review: May-October 1850*

এর উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ হলো: "(বুর্জোয়াশ্রেণি) মানুষের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থচিন্তা ছাড়া, নির্মম 'নগদ টাকার' সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসেবনিকেশের বরফজলে তারা ডুবিয়ে ছেড়েছে ধর্মীয় ভাবাবেগের, বীরত্বব্যঞ্জক উদ্দীপনার, অজ্ঞান ভাবপ্রবণতার সবচেয়ে স্বর্গীয় সব ভাবোচ্ছ্বাসকে। এরা ব্যক্তির গুরুত্বকে টেনে নামিয়েছে বিনিময় মূল্যে ... যে সকল পেশা এতকাল সম্মানিত হয়ে এসেছে এবং মানুষ যাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, বুর্জোয়ারা তাদের প্রত্যেকটির মহিমা কেড়ে নিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, যাজক, কবি, বিজ্ঞানীকে তারা তাদের মাইনে করা মজুরি শ্রমিকে পরিণত করেছে। বুর্জোয়াশ্রেণি পরিবারের আবেগের পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলে পারিবারিক বন্ধনকে শুধুমাত্র একটা আর্থিক বন্ধনে পরিণত করেছে। ... বুর্জোয়ারা দেশকে শহরের নিয়ন্ত্রণে এনেছে ... যেমনভাবে সে গ্রামকে শহরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে, ঠিক তেমনিভাবেই নির্ভরশীল করে তুলেছে অসভ্য ও অর্ধসভ্য দেশগুলোকে সভ্য দেশের উপর, কৃষিভিত্তিক জাতিকে পুঁজিবাদী জাতির উপর, পূর্বকে পশ্চিমের উপর। ... যেসব অস্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়ারা সামন্তবাদকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিলো সেগুলো আজ স্বয়ং বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধেই উদ্যত। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণি কেবল সেই অস্ত্রই তৈরি করেনি যেগুলো তার নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনবে, একই সাথে সে সৃষ্টি করছে সেই মানুষগুলোকেও যারা এই অস্ত্র ধারণ করবে – এরা হলো আধুনিক শ্রমজীবি শ্রেণি অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণি। ... পূর্ববর্তী সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিলো সংখ্যালঘুদের আন্দোলন অথবা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে চালিত আন্দোলন। সর্বহারার আন্দোলন হলো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচালিত সচেতন, স্বতন্ত্র আন্দোলন। ... কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলো কোনোভাবেই কোনো সম্ভাব্য বিশ্বসংস্কারকের আবিষ্কৃত বা খুঁজে পাওয়া কোনো চিন্তা বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে আসেনি। সেগুলো কেবল আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলা এক ঐতিহাসিক আন্দোলন, বিদ্যমান শ্রেণিসংগ্রাম থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পর্কগুলোকে সাধারণভাবে প্রকাশ করে।

... বুর্জোয়ারা আজ আতঙ্কিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করবার আকাঙ্ক্ষাতে। কিন্তু অবস্থিত এই সমাজে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইতোমধ্যেই শুধু অল্প কিছু মানুষের হাতে জমা হয়েছে, দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষের মধ্যে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। ... কমিউনিস্টদের আরও দোষারোপ করা হয় তাদের দেশ এবং জাতি বিলোপের আকাঙ্ক্ষার জন্য। শ্রমজীবি মানুষের কোনো দেশ নাই। যা তাদের নেই, তাদের কাছ থেকে সেটা আমরা কেড়ে নিতে পারি না।" বিগত ১৫০ বছর ধরে পুঁজিবাদের নানাবিধ চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই অনন্য পর্যবেক্ষণের যথার্থতা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইশতেহার শেষ হয় এই ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং উদাত্ত আহবান দিয়ে : "নিজস্ব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গোপন করতে কমিউনিস্টরা ঘৃণাবোধ করে। তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে যে, শুধুমাত্র বর্তমানের সকল সামাজিক অবস্থার জোরপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারার হারাবার কিছু নেই। দুনিয়ার মজদুর, এক হও!" এটাই সর্বহারাশ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাকে চিহ্নিত করে। এরপরে বিষয়টা আর কোনোভাবেই আগের মতো থাকলো না। এই ঘোষণা দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়লো, পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। সমাজ বিকাশের সুনির্দিষ্ট পথ, পুঁজিবাদের বিকাশ, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবেই ইশতেহারে ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলোকেই সমর্থন করে।

বিপ্লবী আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া তখনও গতিশীল। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের বিপ্লবের সময় মার্কস এবং এঙ্গেলস প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। দক্ষিণ জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া হয়ে বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া যখন প্রুশিয়ায় পৌঁছায়, সে সময়ে মার্কস-এঙ্গেলস জার্মানিতে ফিরে যান এবং কোলন থেকে নয়া রাইন

সংবাদ *(Neue Rheinische Zeitung)* নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বুর্জোয়াদের আপোষকামী নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে এ পত্রিকায়। মার্কস-এঙ্গেলস জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের সংঘ গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করবার জন্য উদ্যোগী হন এবং এসকল এলাকায় বৈঠক করতে থাকেন। শুরু হয় সরকারি দমন-পীড়ন। অনেকেই গ্রেফতার হন আর তার সাথে নয়া রাইন সংবাদ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মার্কস ল্যাসালের (ফার্দিনান্দ ল্যাসালে, ১১ এপ্রিল ১৮২৫ - ৩১ আগস্ট ১৮৬৪) সহযোগিতায় পত্রিকাটির প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে মার্কস, এঙ্গেলসসহ আরও অনেককে ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। এই বিচার চলার সময়ে মার্কস নিজেদের কাজের সমর্থনে এক অসাধারণ বক্তব্য আদালতে পেশ করেন যা গোটা আদালতকে প্রভাবিত করে। তাঁরা সকলে অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। নয়া রাইন সংবাদ এর প্রকাশনার কাজ চলতে থাকে।

পত্রিকার মাধ্যমে জনমত তৈরির সাথে সাথে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের মধ্যে একটি সঠিক, দৃঢ় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস সমগ্র জার্মানি চষে বেড়াতে থাকেন। কিন্তু বিদ্রোহের সহায়ক শক্তি হিসেবে অবস্থিত পেটিবুর্জোয়া ডেমোক্রেটদের কাপুরুষতা ও দোদুল্যমানতার সুযোগ নিয়ে প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের দমনে সক্ষম হয়। সরকার মার্কসকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। অন্যদিকে আর্থিক ঘাটতির কারণে বাধ্য হয়ে নয়া রাইন সংবাদ এর প্রকাশও বন্ধ রাখতে হয়। রাইনল্যান্ড থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মার্কস প্রথমে ফ্রাঙ্কফুর্টে যান। সেখান থেকে যান দক্ষিণ জার্মানিতে। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতিও সহায়ক না থাকায় শেষ পর্যন্ত প্যারিসে আশ্রয় নেন। ওই একই সময়েএঙ্গেলসও প্রতিবিপ্লবী শক্তির সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। প্যারিসেও মার্কসের উপর হয়রানি থামলো না। ফলে তিনি শূন্য হাতে লন্ডনে চলে যেতে বাধ্য হন। এখানেই পরবর্তীতে এঙ্গেলস এবং 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। কমিউনিস্ট লীগ শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়, যেটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে নির্বাসিত ব্যক্তি হিসেবে লন্ডনে মার্কসের জীবন শুরু হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

লন্ডন : ফ্রান্সের শ্রেণিসংগ্রাম এবং আঠারোই ব্রুমেয়ার

লন্ডনে মার্কস এবং এঙ্গেলস নয়া রাইন সংবাদ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পর্যালোচনা *(Neue Rheinische Zeitung Politisch–Ökonomische Revue)* নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। কিন্তু এককভাবে ৪টি সংখ্যা এবং একবার দুইসংখ্যা একত্রে ছেপে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। এখান থেকেই বেরিয়ে আসে ১৮৫০ সালে প্রকাশিত এঙ্গেলসের জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ *(Peasant War in Germany)* এবং মার্কসের ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম *(The Class Struggles in France)* বই দুটি। ১৮৫২ সালে মার্কস লুই বোনাপোর্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার *(The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)* রচনা করেন।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। সেখানকার জাতীয় রক্ষিবাহিনী বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়। তারা রাজা লুইস ফিলিপকে অস্থায়ী সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে এবং উদার ও বিপ্লবী সরকার গঠন করে। কিন্তু একই বছরের গ্রীষ্মে প্রতিবিপ্লবী শক্তি পাল্টা আঘাত হানে। গণমানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে ফরাসি সেনাবাহিনী এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনী সম্মিলিতভাবে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করে। এর ফলে সংসদীয় সরকার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই বিষয়গুলোই আলোচিত হয়েছে ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম প্রবন্ধে। ১৮৪৮ সালের শেষ দিকে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পূর্বতন সম্রাটের ভাইয়ের ছেলে লুই নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট ১৮৫১

সালের ডিসেম্বরে ক্যু'র মাধ্যমে নিজের প্রেসিডেন্ট থাকার মেয়াদ আরও ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তী বছরের শুরুর দিকে নিজের স্বৈরশাসনকে সুসংহত করতে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন যা দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটায়। আঠারোই ব্রুমেয়ার-প্রবন্ধে এই ক্যু'র প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

লন্ডনে পৌঁছাবার পর মার্কস প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্য জীবনযাপন করলেও, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রতিটি দিক – ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক – তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফরাসি বুর্জোয়াদের একাংশ, অর্থ নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী অর্থাৎ ব্যাংকার, স্টক এক্সচেঞ্জের মালিক, রেল কোম্পানির মালিক, কয়লা ও লোহা খনির মালিক, বনজ সম্পদের মালিকেরা লুই ফিলিপের ছত্রছায়ায় অভিজাততন্ত্র কায়েম করে রেখেছিলো। অন্যদিকে শিল্পভিত্তিক বুর্জোয়ারা ছিলো বিরোধীপক্ষে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পাশাপাশি লড়াই করেছিল যার ফলে লুইস ফিলিপ গদিচ্যুত হয় এবং অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। লড়াইরত শ্রমিকদের কাছে এই লড়াই ছিল একটি ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই যেখানে শ্রমিকরা তাদের পূর্ণ অধিকার পাবে। কিন্তু বুর্জোয়াদের কাছে এই লড়াই ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করবার একটা উপায়মাত্র, যার মাধ্যমে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং যেখানে চূড়ান্তভাবে বুর্জোয়া শ্রেণিশাসন কায়েম হবে। তাদের লক্ষ্য তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্তবর্তীকালীন সরকারের একটা বড় অংশ ছিলো বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী, তারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর শ্রমিকদের জাগরণকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়। শ্রমিকদের পরাজিত হবার কারণগুলো হলো : তাদের সামনে কোনো সুস্পষ্ট বিপ্লবী আদর্শ ছিলো না, পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত ও কৃষিজীবিদের নিয়ে গঠিত মধ্যস্তরের শ্রেণিগুলোর সমর্থন বুর্জোয়াদের পক্ষে ছিলো এবং সর্বোপরি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকাশ তখন পর্যন্ত সর্বহারা বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি।

ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম প্রবন্ধটি হলো মার্কসের চোখের সামনে চলমান বৈপ্লবিক বিকাশের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্টভাবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের প্রথম প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে মার্কস তাঁর তত্ত্বসমূহকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেন এবং সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যার মধ্যে আছে – বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্ক কি হবে এবং বিপ্লব পরবর্তী ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতার বিষয়টি কিরূপ হবে। মার্কসের ভাষায়: "ফরাসি শ্রমিকরা এক পাও এগোতে পারবে না, বুর্জোয়া কাঠামোর একটা কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না – যতদিন না বিপ্লবের প্রক্রিয়া দেশের জনগণকে জাগিয়ে তুলবে; কৃষক ও মধ্যবিত্ত যারা সর্বহারা এবং বুর্জোয়াদের মাঝামাঝি অবস্থান করছে, শ্রমিকরা তাদেরকে এই কাঠামোর বিরুদ্ধে, এই পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে, তাদেরকে বাধ্য করবে মিত্র হিসেবে সর্বহারাদের সাথে যুক্ত হতে.....আমরা দেখবো যে ধীরে ধীরে কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, সাধারণ অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়ে তার শত্রু হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে... ...কাতারে কাতারে সর্বহারারা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে...এই সমাজতন্ত্র হলো বিপ্লবের সংহতির বার্তা, সাধারণ অর্থে শ্রেণির অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালব্যাপী সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব, উৎপাদনের সমস্তধরনের সম্পর্ক যার মধ্যে শ্রেণিবিভাজন অবস্থিত – তার বিলোপ, সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্ক যা উৎপাদনের এই বৈষম্যমূলক সম্পর্কের পরিপূরক, এই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী সমস্ত ধরনের চেতনার আমূল পরিবর্তন। ...সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে বুর্জোয়ারা নিজেদের যে গণতান্ত্রিক চেহারা হাজির করেছিল এবং এর ফলে যে জনসমর্থন অর্জন করেছিল, এখন তাকেই প্রত্যাখ্যান করে

প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে "এখন পর্যন্ত জনগণের যে আকাঙ্ক্ষার উপর দাঁড়িয়ে আমাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত, জনগণের ওই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধেই এখন তাকে সুসংহত করতে হবে।" [১১]

আঠারোই ব্রুমেয়ার প্রবন্ধে দেখা যায় যে, মার্কস ইতোমধ্যে অর্থনীতির উপর আরও বিস্তৃত অধ্যয়ন করেছেন এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। এরই মধ্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্র আরও বেশি করে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। গোটা বুর্জোয়াশ্রেণির পক্ষে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যকার আপোষকামী ধারা হিসেবে সোস্যাল ডেমোক্রেসির (উদার গণতান্ত্রিক শক্তি) ঐতিহাসিক ভূমিকার সূচনাকে কার্ল মার্কস অসামান্য প্রতিভার দ্বারা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। ব্রুমেয়ার প্রবন্ধে ফ্রান্সের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট গতিপথকে বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখান : "... ব্যক্তিগত জীবনে একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে যা ভাবে ও বলে, তার বিপরীতে সে যা করে তা যেমন পার্থক্য করা যায়; তেমনি ঐতিহাসিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে দলগুলোর গরম বকুনি এবং গালগপ্পো থেকে তাদের আসল কাজ ও উদ্দেশ্য, তাদের নিজেদের সম্পর্কিত ধারণা এবং বাস্তবতার পার্থক্যকে অবশ্যই আরও সুস্পষ্ট করে দেখা দরকার...সর্বহারাদের সামাজিক দাবি বৈপ্লবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে পিছিয়ে গিয়ে গণতান্ত্রিক দাবিতে পরিণত হয়; পেটিবুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবির মধ্য দিয়ে এর রাজনৈতিক রূপটি আড়াল হয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপটি সামনে বেরিয়ে আসে। আর এ থেকেই উৎপত্তি হয় সোস্যাল ডেমোক্রেসির ... সোস্যাল ডেমোক্রেসির বৈশিষ্ট্যকে এক কথায় বলা যায় যে এ হলো ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান প্রতিষ্ঠান, যা দুই চরম বিপরীত – পুঁজি এবং মজুরি শ্রমের মধ্যকার বিরোধ নির্মূল না করে বরং এদের মধ্যকার সংঘাতকে দুর্বল করে দিয়ে এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার উপায়মাত্র ... বুর্জোয়াদের মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টি আছে যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সব হাতিয়ার তারা গড়ে তুলেছে তা তাদের দিকেও তাক করা যায়, যে সকল শিক্ষার মাধ্যম তৈরি করেছে তা নিজস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে পারে এবং যে সমস্ত ঈশ্বর এর থেকে উৎসারিত তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হতে পারে। এরা এটা বুঝতে পারে যে, তথাকথিত সকল বুর্জোয়া স্বাধীনতা এবং প্রগতির অঙ্গসংগঠনগুলো আক্রমণের মাধ্যমে এদের শ্রেণিশাসনকেই সামাজিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিপন্ন করে তুলতে এবং এর ফলে 'সমাজতান্ত্রিক' রূপ লাভ করতে পারে ..... বুর্জোয়া রিপাবলিক বলতে বোঝায় এক শ্রেণির উপর অন্য শ্রেণির সীমাহীন কর্তৃত্ব।"[১২] এটা আসলেই আশ্চর্যজনক যে সে সময়ে কীভাবে মার্কস সোস্যাল ডেমোক্রেসির এরকম অন্তর্ভেদী এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন – আজকের প্রেক্ষাপটে যা পঁচে যাওয়া আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত, শুধুমাত্র শ্রম এবং পুঁজির মধ্যকার আপোষকামী শক্তি হিসেবেই নয় বরং যা পুঁজিবাদের শেষ অবলম্বন হিসেবে ভেতর থেকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের নেতৃত্বদানকারী।

প্যারী কমিউন

প্রায় বিশ বছর বাদে, প্যারী কমিউনের সময়ে মার্কস আবারও সরাসরি বিপ্লবী লড়াই পর্যবেক্ষণ করতে পারলেন। ১৮৭০-৭১ এর ফ্রান্স-প্রুশিয়ার যুদ্ধের সময়ে, প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে মার্কস যুদ্ধরত বোনাপোর্ট এবং বিসমার্ক উভয় পক্ষকেই হানাদার বলে চিহ্নিত করেন। নিজে জার্মান হলেও তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সাথে সাথে জার্মানির সত্যিকারের কল্যাণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল, হানাদার প্রুশিয়ান সাম্রাজ্যের যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা – এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন। তিনি আনন্দের সাথে লক্ষ করলেন যে ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয় দেশের অগ্রসর শ্রমিকরা সঠিক আন্তর্জাতিকতাবাদী পদক্ষেপ নিয়েছেন : "এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইতিহাসে আগে যা দেখা যায়নি – এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এঁকে চলেছে। এটা প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় বর্তমান

১১. *The Class Struggles in France*
১২. *Eighteenth Brumaire*

সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক দীনতা এবং রাজনৈতিক দোদুল্যমানতার কারণে একটা নতুন সমাজ জেগে উঠছে, যার আন্তর্জাতিক নিয়ম হবে শান্তি। কারণ সব রাষ্ট্রেরই শাসক হবে এক – শ্রমিক শ্রেণি!"[১৩]

যুদ্ধে বোনাপোর্টের পরাজয়ের পর থিয়ারের (এডলফ থিয়ের, ১৫ এপ্রিল ১৭৯৭ - ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) নেতৃত্বে প্যারিসে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম আরও তীব্র রূপ ধারণ করবে এই অনুমান থেকে মার্কস ফরাসি শ্রমিকদের অসময়ে অসংগঠিত বিদ্রোহ সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দেন। কিন্তু ১৮ মার্চ, ১৮৭১ সালে থিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিদ্রোহ শুরু হলো। এটিই হলো মহান প্যারী কমিউন যা ছিলো পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রথম প্রচেষ্টা। মার্কস তখন প্যারিসের শ্রমিকদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন শাখায় প্যারিস অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অজস্র চিঠি লিখলেন এবং তাদেরকে এই অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রচার চালাতে উদ্বুদ্ধ করলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস বার্তাবাহকদের দ্বারা চিঠি এবং মৌখিক নির্দেশনা পাঠিয়ে এই বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং নানান ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে তাদের সতর্ক করতেন। যদিও তাদের উপদেশ এবং পরামর্শ সব ক্ষেত্রেই যথাযথ সময়ে পৌঁছাতে পারেনি কারণ প্যারিসে তখন বিদ্রোহীরা অবরোধের মধ্যে ছিলো। এছাড়াও কমিউনের নেতৃত্বদানকারী প্রুঁধোপন্থীও ব্ল্যাঙ্কিপন্থীরা নানাধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং দোদ্যুল্যমান অবস্থায় ভুল পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলো। অবরোধের মধ্যেও মরণপণ লড়াই লড়ে পরাজিত হয় বিদ্রোহী শ্রমিকরা। রক্তে ভেসে যায় প্যারী কমিউন। তারপরও প্যারী কমিউন পুঁজিবাদ বিরোধী প্রথম লড়াই হিসেবে সর্বহারা বিপ্লবের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবে চিরকাল।

কমিউনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করেন মার্কস তাঁর ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ *(The Civil War in France)* পুস্তিকায়, যা ইন্টারন্যাশনালের সাধারণ সভায় ভবিষ্যতের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অমূল্য শিক্ষা হিসেবে গৃহীত হয়। সেখানে তিনি দেখান : "যত দ্রুত আধুনিক শিল্পের বিকাশ এবং বিস্তৃতি ঘটছে, ততই তা পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যকার শ্রেণি-বিরোধ আরও তীব্র করে তুলছে, রাষ্ট্র শক্তি আরও বেশি বেশি করে শ্রমের উপর জাতীয় পুঁজির পক্ষালম্বন করছে, সামাজিক দাসত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক শক্তি সংগঠিত করছে, এবং শ্রেণি শোষণের চালিকাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি বিপ্লবেই শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রগতিশীল দিকটি চিহ্নিত হয়, রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্র আরও স্থূল আকারে প্রকাশিত হয়... সর্বহারাদের আশঙ্কাজনক উত্থানের প্রেক্ষিতে এরা পুঁজির পক্ষ নিয়ে জাতীয় যুদ্ধযান হিসেবে রাষ্ট্রশক্তিকে শ্রমের বিপক্ষে নির্মম এবং নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে এদের এই বিরামহীন জিহাদের পাশাপাশি তারা শাসকদের দমনমূলক হাতিয়ারকে শুধু শক্তিশালীই করে না, একই সাথে নিজেদের শাসকদের প্রতিরোধের সমস্ত উপায় – পার্লামেন্টারি ক্ষমতা, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এগুলোকেও একে একে দুর্বল করে তোলে। ...বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় সভ্যতা আর ন্যায়বিচারের স্বরূপ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে পড়ে যখন এ ব্যবস্থার দাস এবং শ্রমজীবীরা তাদের মালিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর তখনই এই সভ্যতা আর ন্যায়বিচার খোলাখুলি তার বর্বরতা এবং স্বেচ্ছাচারী প্রতিশোধপরায়ণতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। উৎপাদক এবং শোষকের মধ্যকার প্রতিটি নতুন শ্রেণিসংগ্রাম এই বাস্তবতাকে আরও তীব্রভাবে সামনে নিয়ে আসে... শ্রমজীবীরা কমিউনের কাছ থেকে অলৌকিক কোনো কিছু প্রত্যাশা করে না। তাদের সামনে তৈরি হওয়া কোনো স্বর্গরাজ্য নেই... তারা জানে যে নিজেদের মুক্তির জন্য এবং এর সাথে সাথে বর্তমান সমাজ তার নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা যে অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে, তার থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার জন্য তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন

১৩. *Karl Marx: The Civil War in France, The First Address, July 23, 1870 [The Beginning of the Franco-Prussian War]*

করে একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণি শুধু পূর্বপ্রস্তুত রাষ্ট্রযন্ত্রকে করায়ত্ত করে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করবে –এমনটি নয়।"[১৪]

লন্ডনের প্রবাস জীবন

লন্ডনে মার্কসের প্রবাসী জীবন ছিলো ৩০ বছরের। লন্ডনের এই পুরো সময়টাই ছিলো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী তত্ত্ব ও তার প্রায়োগিক দিক বিকাশের ধারাবাহিক, সচেতন ও সক্রিয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কিছু সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট আর্ন্তজাতিকসহ বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন তিনি সংগঠিত করেছেন। অনেকসময় যেসব বিষয় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেসব নিয়ে প্রচারপত্র ও জার্নালে লিখেছেন। অন্যান্য সময়ে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের অমূল্য ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, দর্শনের গভীর অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায়ই দেখা যেত যে, তিনি এসব কাজের কোনো না কোনো একটা নিয়েই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই মার্কস এবং তার পরিবারকে লাগাতার অভাব, দুর্দশা, অপুষ্টি, অনাহার, রোগ ও মৃত্যুকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। কেবলমাত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নিজের উপর অটল আস্থা নিয়ে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে তিনি বিরামহীন এগিয়ে গেছেন। এই উদ্দেশ্য হলো সর্বহারা শ্রেণি তথা মানবসমাজ ও সভ্যতার ঐতিহাসিক পরিণতি। এটিই তাঁকে এই বিরামহীন সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আর এ লড়াইয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে পাশে ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং সহযোদ্ধা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।

১৮৪৯ সালের জুন মাসে মার্কস পরিবারসহ লন্ডনে পৌছান। সে সময়ে তাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা ছিলো না। আয়-উপার্জনের কোনোপথও তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। ট্রিয়ারে মার্কসের বিষয় সম্পত্তি যতটুকু ছিল তা বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তাও খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ১৮৫০ সালে এঙ্গেলস ম্যানচেস্টারে একটা চাকরিতে যোগদান করেন এবং তারপর থেকে মার্কসের পরিবারিক খরচের একটা বড় অংশ তিনি বহন করতেন। দু'জনের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই চিঠি আদানপ্রদান চলতো। ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত নিউইয়র্ক এর প্রগতিশীল পত্রিকা ডেইলি ট্রিবিউন এ মার্কস নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

এঙ্গেলস নিজে থেকেই মার্কসকে সহযোগিতা করবার জন্য অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন যেন এগুলোর জন্য মার্কসের বেশি সময় এবং শ্রম ব্যয় করতে না হয়, যাতে তাঁর আরও গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল – ভারতে ব্রিটিশ শাসন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, এঙ্গলো-চাইনিজ যুদ্ধ এবং তাইপিং বিদ্রোহ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, স্পেনের যুদ্ধ এবং ১৮৫৪'৫৬ সালের বিপ্লব, জার্মানির অবস্থাসহ আরও নানান প্রবন্ধ। সঠিক এবং যথার্থ বস্তুবাদী বিশ্লেষণ, তথ্য ও যুক্তির উপর দখল, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতি এবং বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর প্রতি সক্রিয় সমর্থনে এই প্রবন্ধগুলো ছিলো পরিপূর্ণ।

ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণির আন্দোলন বিকাশের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস খুবই সচেতনভাবে লক্ষ রাখতেন। পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের প্রগতিশীল বাম-ঘরানার চার্টিস্ট নেতৃত্বকে তাঁরা সহায়তা করবার চেষ্টা করেন।

১৮৫৭ সালের অর্থনৈতিক সংকট মার্কসকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে মনোনিবেশ করতে। আর এই গভীর অধ্যয়নের ফলাফল হলো '*Basic Features of the Critique of the Political Economy*'।

১৪. *Karl Marx: The Civil War in France, The Third Address, May, 1871, [The Paris Commune]*

গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটিকে মার্কসের অনন্য সৃষ্টি 'দাস ক্যাপিটাল'-এর সূচনা বলা যেতে পারে। তবে এটি একটি অসমাপ্ত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হিসেবে থেকে যায়। মার্কসের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৩৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এখানেই মার্কস প্রথম তাঁর 'উদ্ধৃত মূল্য তত্ত্বে'র প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত *Contribution to the Critique of Political Economy* বইটি তাঁর 'মূল্য তত্ত্ব' এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য বিখ্যাত অবদানগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা হাজির করা হয় 'দাস ক্যাপিটাল' (পুঁজি) বইয়ে। এই বইটির সূচনায় আছে মার্কসের হাতে বিকাশ লাভ করা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল বর্ণনা।

এরপরই মার্কস কিছুদিনের জন্য অর্থনীতির উপর পড়ালেখা বন্ধ করে মনোযোগ দেন মহাদেশের চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে। ইতালিতে সে সময় অস্ট্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একত্রিত হবার সংগ্রাম শুরু হয়। জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে একত্রিত হবার সংগ্রামও তখন চলমান। মার্কস তাঁর প্রবন্ধগুলোতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতার উপর জোর দেন এবং তা আরও বিস্তৃত করার জন্য জনগণের আরও বিশাল অংশ – পেটিবুর্জোয়া, কৃষক এবং সর্বহারাদের সংযুক্ত করার কথা বলেন।

এসময়ে মার্কস এবং ল্যাসালের মধ্যে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। ল্যাসালে জার্মানির একীভূতকরণের জন্য প্রুশিয়ার উত্থাপিত প্রস্তাবে সমর্থন দেন, যা ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া। অন্যদিকে মার্কসের প্রস্তাব ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে নিচ থেকে এই ঐক্য অর্জন করা। ল্যাসালে 'জেনারেল এসোসিয়েশন অফ জার্মান ওয়ার্কার্স'-এর প্রধান হিসেবে যে কর্মসূচির প্রস্তাব দেন তা পুরোপুরি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে গৃহীত প্রস্তাবের বিপরীত। ল্যাসালে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ও আইনগতভাবে দাবি আদায়ের প্রস্তাব করেন এবং তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রুশিয়ান রাষ্ট্রের সহযোগিতা-সহানুভূতির উপর নির্ভর করবার প্রস্তাব করেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ধর্মঘট এবং শ্রেণিসংগ্রামকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। তার কাছে কৃষকরা হলো একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি, যারা সর্বহারাশ্রেণির মিত্র নয়। তিনি বিসমার্ক-এর সাথে গোপন চুক্তি করেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস ল্যাসালের এই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর নীতির বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, যা ল্যাসালের মৃত্যু পর্যন্ত জারি থাকে।

রাশিয়ায় কৃষকদের ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে মার্কস সমর্থন করেন। ষাটের দশকের শুরুর দিকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল একটা প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনা, মার্কস একে স্বাগত জানান। মার্কস একে দেখেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক দাসত্ব বনাম আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লড়াই হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে একটা চিঠিও তিনি লিখেছিলেন এ বিষয়ে। তিনি আমেরিকার উত্তর অংশকে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে দাসব্যবস্থার বিলোপ এবং কৃষকদের পক্ষে কৃষি সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সামাজিকভাবে আরও বিস্তৃত করার আহবান জানান। একই সাথে ইউরোপের শ্রমিকদের এই আহ্বান জানান যে, তারা যেন লক্ষ রাখে যে তাদের নিজ নিজ দেশের সরকার দক্ষিণ অঞ্চলের দাস মালিকদের সহায়তা করতে না পারে।
এরপরই, মার্কস আবার অর্থনীতির উপর তাঁর কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এই নতুন কাজগুলো আগের কাজ *Critique of Political Economy*-র ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশ না করে স্বতন্ত্র কাজ হিসেবে *Capital : A Contribution to the Critique of Political Econo* নামে প্রকাশ করবেন।

ক্যাপিটাল লিখিত হয়েছিল চরম অভাব, দারিদ্র্য এবং কষ্টের কালে। নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে লিখিত আর্টিকেল থেকে মার্কসের যা আয় হতো, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে তা কমতে কমতে একদম বন্ধ

হয়ে গেল। প্রধানত এঙ্গেলসের অর্থনৈতিক সহায়তা তাঁরা পেতেন। তারপরও পুরো পরিবার খুব কষ্ট করে চলতো। মার্কস তখনও দিনের পর দিন বছরের পর বছর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়ালেখা করেছেন, এমনকি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েও ক্রমাগত অধ্যয়ন করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের কাজ সমাপ্ত হয় ও ১৮৬৭ সালে তা প্রকাশিত হয়।

দাস ক্যাপিটাল

মার্কস তাঁর এই মহৎ সৃষ্টিকর্মে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার অভ্যন্তরীণ নিয়মের কারণেই অবশ্যম্ভাবীরূপে এক ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, উইলিয়াম পেটি এবং ডেভিড রিকার্ডোর কাজগুলোর উপর দাঁড়িয়ে মার্কস তাঁদের এবং তাঁদের পূর্ববর্তী বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের জগৎ অতিক্রম করে যান। নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না এমন পুরাতন তত্ত্বকে বর্জন করেন এগিয়ে যান এবং হাজির করেন কার্যকর নতুন তত্ত্ব।

প্রতিটি পর্যায়েই মার্কস বাস্তব জীবন থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেন, প্রতিটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে যুক্তির আলোয় নিরীক্ষা করেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই নিজের বক্তব্যগুলোকে যৌক্তিক কাঠামোতে হাজির করে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন – যেভাবে একজন পদার্থবিদ একটা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করেন বা একজন জীববিজ্ঞানী একটা প্রাণীকে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসেন।

'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর মার্কসের বক্তব্য এবং সিদ্ধান্তগুলো এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। আমরা শুধুমাত্র এর প্রধান বিষয়গুলো আলোচনা করবো, যা এঙ্গেলস বর্ণনা করেছিলেন এই গ্রন্থের মূল্যায়নে। এঙ্গেলসের ভাষ্যমতে, মার্কস দেখিয়েছেন যে, "শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম যা তার মজুরির অতিরিক্ত, তাই হলো উদ্বৃত্ত মূল্যর উৎস, লাভের এবং ক্রমবর্ধমান পুঁজির উৎস।...শ্রমশক্তির মূল্য চুকিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু যে মূল্য তাদের দেয়া হয় তা পুঁজিপতিরা এই শ্রমশক্তি থেকে যা আদায় করে নেয় তার তুলনায় একদমই অল্প।এটাই হলো পার্থক্য, এই অপরিশোধিত শ্রমই হলো পুঁজিপতিদের ভাগ অথবা আরও যথার্থভাবে বললে পুঁজিপতিশ্রেণির ভাগ ... শোষিতশ্রেণিকে সবসময়ই এই মজুরিহীন শ্রম দিতে বাধ্য থাকতে হয়। ...এর (মজুরিহীন শ্রমের) রূপএখন বদলে গিয়েছে, কিন্তু মূলবিষয় একই আছে : 'যতদিন সমাজের একাংশ উৎপাদনের উপায়ের উপর একক কর্তৃত্ব বজায় রাখবে, ততদিন শ্রমজীবীদের, তা সে স্বাধীন হোক বা পরাধীন, নিজের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার বাইরেও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ব্যয় করতে হবে। আর তা করতে হবে উৎপাদনের উপায়ের যে মালিক, তাদের বেঁচে থাকার জন্য।' ...এবং যখন এটা (পুঁজি) নিজেই আরও বড় পরিসরে পুনরুৎপাদিত হয়, তখন আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা আরও বড়পরিসরে, আরও বেশি সংখ্যায় সম্পদহীন শ্রমিকশ্রেণি তৈরি করতে থাকে। ...ক্রমবর্ধমান এই শ্রমিকদের শেষ পর্যন্ত কি হয়? এরা শিল্প ক্ষেত্রে মজুদ বাহিনীতে পরিণত হয়... তাদের শ্রমের চেয়েও কম মজুরি প্রদান করা হয়...'সামাজিক সম্পদ যত ব্যাপক হয়...তত বেশি ঘটে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনগোষ্ঠী অথবা মজুদ শ্রমিক বাহিনী তৈরি। কিন্তু সক্রিয় (নিয়মিত চাকুরিরত) শ্রম-বাহিনীর তুলনায় এই মজুদ বাহিনী বা শ্রমিকদের স্তর যত বড় হয় সে অনুপাতে তাদের যন্ত্রণা এবং দুর্দশা বাড়তে থাকে। যত ব্যাপক মাত্রায় এই সর্বহারা শ্রমজীবী এবং মজুদ শ্রমিক বাহিনী তৈরি হয় ততই স্বীকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাড়তে থাকে। আর এটাই হলো পুঁজিবাদী সঞ্চয় এর চূড়ান্ত সাধারণ নিয়ম'।"[১৫]

পুঁজিবাদ থেকে উচ্চতর সামাজিক ব্যবস্থায় পৌছাবার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বিবৃত হয়েছে মার্কসের ঐতিহাসিক উপসংহারে: "একচেটিয়া পুঁজি যা উৎপাদনের উপায়ের মধ্যেই জন্ম লাভ করে এবং এর অভ্যন্তরেই বেড়ে উঠে তা শেষ পর্যন্ত উৎপাদন উপায়ের শৃঙ্খলে পরিণত হয়। উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছায় যে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে তা আর মিলেমিশে চলতে পারে না। এই বৈপরীত্য বিস্ফোরিত হয়ে দুইভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পদের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে থাকে। বঞ্চনাকারীরাই হয় বঞ্চিত। পুঁজিবাদী উপায়ে উৎপাদনের ফলাফল হলো পুঁজিবাদের সম্পদ গ্রাসের প্রবণতা, যা সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা। এটা হলো ব্যক্তির নিজস্ব পরিশ্রম থেকে গড়ে তোলা ব্যক্তিগত সম্পদের বিলোপের প্রথম ধাপ। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘভাবে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিই আবার সৃষ্টি করে নিজের ধ্বংসের কারণ। এটাকে বলা যায় অবলুপ্তির অবলুপ্তি। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারীরা আবার তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফিরে পাবে না, কিন্তু পুঁজিবাদে সঞ্চিত ব্যক্তিসম্পদের অধিগ্রহণের মাধ্যমে, যেমন জমি এবং উৎপাদনের উপকরণের উপর যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১৬]

'ক্যাপিটাল'-এর বাকি খণ্ডগুলোর প্রকাশ করার কাজ খানিকটা ব্যাহত হয়। কারণ মার্কস তখন প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর সাথে আরও যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী – যেমন ফরাসি-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও প্যারী কমিউন। ১৮৭০ সালের পরে তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর কাজে আবার মনোযোগ দেন। তাঁর বাকি সমগ্র জীবনই তিনি এই কাজের জন্য ব্যয় করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ক্যাপিটালের ২য় এবং ৩য় খন্ডের কাজ সমাপ্ত করবার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর আজীবন সঙ্গী এঙ্গেলস তখন সম্পাদনা করে এগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

২য় খণ্ডে মার্কস দেখান বিক্রয় চক্র, লাভ ও সম্পদের বিনিয়োগ, লাভ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের পুনর্বিনিয়োগ এবং জটিল কার্যকারণগুলো যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সার্বিক সংকটের জন্য দায়ী।

তৃতীয় খণ্ডে জমির ভাড়া, উদ্বৃত্ত মূল্যের লাভে রূপান্তর ও এর ফলস্বরূপ মূল্য এবং দাম-এর মধ্যকার সম্পর্ক, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে গড় লাভের সামগ্রিক দিকসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে মার্কস বিস্তৃত আলোচনা করেন। ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডের মূল বিষয় ছিলো পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদনব্যবস্থা এবং মজুরি-শ্রম। ফলে মার্কস শিল্পে অগ্রসর ব্রিটেনকেই প্রধান উদাহরণ হিসেবে বেছে নেন এবং ব্রিটিশ শিল্প অর্থনীতির আলোচনা করেন। তৃতীয় খণ্ডের ভূমিভাড়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে মার্কস রাশিয়ায় জমির উপর বিভিন্ন ধরনের মালিকানা এবং কৃষি প্রক্রিয়ায় শোষণের রূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ক্যাপিটাল হলো মহান এই রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং বিপ্লবী কার্ল মার্কসের জীবনব্যাপী কর্মের সর্বোচ্চ নিদর্শন। এটা হলো একজন অসামান্য প্রতিভাবান মানুষের অতিমানবীয় কর্ম। মার্কসের কথায়: "বিজ্ঞানের পথে কোনো সহজ রাস্তা নেই। এর আলোকজ্জ্বল চূড়ায় তারাই পৌছতে পারবে যারা এর কষ্টকর পথের ক্লান্তিহীন আরোহণকে ভয় পায় না।"[১৭]

প্রথম আন্তর্জাতিক: সর্বহারার মহান নেতা মার্কস

এটা বিস্ময়কর যে এ-রকম তীব্র এবং প্রায় বিরামহীন অধ্যয়ন, গবেষণা ও জটিল বিষয়ের উপর লেখালেখির পরও মার্কস সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়ে একনাগাড়ে লেগে থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি সর্বহারাদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। পল লাফার্গ বলেন, "মার্কস হলেন সেইসব দুর্লভ মানুষদের

১৫. *Reviews of Capital by Frederick Engels 1867*
১৬. *Capital, Volumn 1, Chapter 32*
১৭. *Capital Vol. 1,Preface to the French Edition, 1872*

একজন যে একই সাথে বিজ্ঞানের জগতে এবং সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিতে পারেন; এই দুই দিকই তাঁর মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাঁকে বুঝতে হলে একদিকে বিদ্বান এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক যোদ্ধা – তাঁর এই দুটো দিককে নিয়েই বুঝতে হবে।"[১৮]

১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ লন্ডনের সেইন্ট মার্টিন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে ইংরেজ এবং ফরাসি শ্রমিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন গণতন্ত্রী ও প্রবাসী সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই পরবর্তীতে প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিতি পায়। এর সূচনা বক্তব্য এবং সাধারণ নীতিমালা প্রস্তুত করেন মার্কস।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে একটা বিপ্লবী রূপ দেবার দায়িত্ব মার্কসের উপর বর্তায়। ঐতিহাসিক এই দাবি পূরণে মার্কস তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসেন। সূচনা বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন : "ইউরোপের সমস্ত দেশে সকল সংস্কারমুক্ত মননে আজ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য মানুষদের বোকার স্বর্গে আটকে রাখার মধ্যে যাদের স্বার্থ রয়েছে একমাত্র তারাই এই সত্যকে অস্বীকার করে, তা হলো, যন্ত্রাদি যত উন্নতই হোক না কেন, উৎপাদনে বিজ্ঞানকে যে মাত্রায়ই ব্যবহার করা হোক না কেন, যোগাযোগের পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, কোনো নতুন উপনিবেশ, নতুন দেশ, নতুন বাজার, মুক্ত বাণিজ্য বা এইসব একসাথে মিলেও শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশা দূর করতে পারবে না; বরং বর্তমানের এই মিথ্যা ভিতের উপর দাঁড়িয়ে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তির প্রতিটি নতুন বিকাশ সামাজিক বৈষম্যকে আরও গভীর আর সামাজিক সংঘর্ষকে আরও প্রকট করে তুলবে। ... আর এজন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিকশ্রেণির মহান কর্তব্য ... 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!'[১৯]

আন্তর্জাতিকের সাধারণ নীতিমালায় মার্কস যুক্ত করেন, "... শ্রমজীবী জনগণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি;...এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ যাবৎকাল পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে প্রতিটি দেশের শ্রমিকদের নিজেদের নানাভাগের মধ্যে সংহতি এবং বিভিন্ন দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ভাতৃপ্রতিম বন্ধনের অভাবে; ... শাসকশ্রেণির যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বহারারা একক শ্রেণি হিসেবে ক্রিয়া করতে পারবে তখনই যখন তারা শাসকশ্রেণির বিদ্যমান সকল রাজনৈতিক দলকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারবে। সর্বহারাদের রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার এই বিধান সামাজিক বিপ্লবে জয়ী হবার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রেণি উচ্ছেদের লক্ষ্যের অপরিহার্য শর্ত। শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্ন শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত সমঝোতাকে অবশ্যই শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে শ্রেণি-হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে।"

আর সহজাত দক্ষতায় মার্কস দেখালেন কীভাবে অসংগঠিত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে সর্বহারা বিপ্লবী সচেতনতায় নিয়ে আসা যায় এবং তা থেকে সর্বহারাশ্রেণির দল সংক্রান্ত উপলব্ধি তৈরি করা যায়। জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী জাত্যাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন তিনি নতুন স্লোগানের মাধ্যমে – "দুনিয়ার মজদুর, এক হও!" সেই সময়ের পরিস্থিতিতে এই ধারণার অপরিসীম বিপ্লবী তাৎপর্য ছিল। এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গভীর উপলব্ধি এবং দূরদৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা এক কথায় বিস্ময়কর!

মার্কস-এর উদ্যেগে, আন্তর্জাতিকের সাধারণ সভা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশে শ্রমিকদের ধর্মঘটে নৈতিক এবং বাস্তব সহায়তা প্রদান করে।

১৮. *Paul Lafargue: Reminiscences of Marx (September 1890)*
১৯. *Inaugural Address of the International Working Men's Association; "The First International"*

১৮৬৫ সালের দুটি সাধারণ সভায় মার্কস *Theory of value, price and wages*-এর উপর (মজুরি, মূল্য ও দাম সম্পর্কিত তত্ত্ব) বিশেষ রিপোর্ট প্রদান করেন। এর মূল অংশ পরবর্তীতে *Wages, Price and Profit* (মজুরি, দাম ও মুনাফা) হিসাবে ছাপা হয়, যেখানে বক্তব্য আকারে এ সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয় যা পরবর্তীতে ক্যাপিটাল-এ বিস্তারিত আলোচিত হয়।

মার্কস সাধারণ পরিষদের সদস্যদের শ্রমিকদের মিটিংয়ে যোগ দেবার চর্চা চালু করেন যেন আন্তর্জাতিকের আহবান ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুতই আন্তর্জাতিকের শাখা ইংল্যান্ড, ফ্র্যান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়ামসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানিতে শাখা চালু করতে গিয়ে সমস্যা হলো। কারণ জার্মান আইনে বিদেশি কোনো সংগঠনের সাথে শ্রমিকদের যুক্ত হবার অনুমোদন ছিলো না এবং জার্মান শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব ছিলো ল্যাসালে-পন্থিরা।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আদর্শিক লড়াই

মার্কস ভ্রান্ত আদর্শ এবং চর্চার বিরুদ্ধে লড়বার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রুঁধোর মৃত্যুর পর বার্লিনের ল্যাসালে-পন্থি পত্রিকা *Sozial Demokrat*-তে *On Proudhon* (প্রুঁধো প্রসঙ্গে) নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি প্রুঁধোর নাম উল্লেখ করে তার পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সংশোধনবাদী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসহ অন্যান্য সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনা করেন এবং একই প্রবন্ধে ল্যাসালের নাম উল্লেখ না করে তার ভুল ধারণারও সমালোচনা করেন।

এটা বোঝা দরকার যে 'আন্তর্জাতিক' সুসংহত কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না বরং একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো ছিল যা বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং আন্দোলনের পথনির্দেশ করতো। এটি প্রায়শই কাল্পনিক, বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তো। এসব ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর আদর্শ ও ধারণাকে পরাজিত করে মার্কস-এঙ্গেলসের প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তখন পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে আদর্শিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার ফলে একদম শুরু থেকেই আন্তর্জাতিকের ফোরামে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে এর বিরুদ্ধে আদর্শিক এবং সাংগঠনিক লড়াই চালাতে হয়েছিল। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে প্রুঁধো-পন্থি, ইংল্যান্ডেওয়েন-পন্থি, ইটালিতে ম্যাজিনি-পন্থি এবং জার্মানিতে ল্যাসালে-পন্থিরা ছিলো বিরোধী পক্ষে। পরবর্তীতে বাকুনিন *(Mikhail Bakunin)* এবং তার নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়েছিল।

১৮৬৫ সালের লন্ডন কনফারেন্সে প্রুঁধো-পন্থিদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা জেনেভা কংগ্রেস পর্যন্ত (১৮৬৬) জারি ছিলো। পরের এই কংগ্রেসে, মার্কস কিছু কর্মসূচি প্রস্তাব করেন যার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন ও পোল্যান্ডে গণতান্ত্রিক আইন প্রবর্তনের আন্দোলনে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি প্রতিনিধিদের প্রতি আরও আহবান করেন, শ্রমিকরা যেন ট্রেড ইউনিয়নকে শুধু দৈনন্দিন অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে না দেখে সমাজতন্ত্র প্রচারের উপায় এবং সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করার মাধ্যম হিসেবে দেখে। প্রুঁধো-পন্থিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনেভা কংগ্রেসের বেশিরভাগ প্রতিনিধি মার্কসের সঠিক কর্মসূচিকে সমর্থন জানান। কিন্তু ১৮৬৭ সালের লাউসানি (সুইজারল্যান্ডের শহর) কংগ্রেসে প্রুঁধো-পন্থিরা সংখ্যাধিক্য অর্জন করে এবং তাদের কিছু বিভ্রান্তিকর দাবি গৃহীত হয়। ১৮৬৮ সালের ব্রুসাইস (বেলজিয়ামের শহর) এবং ১৮৬৯ সালের বাসেল (সুইজারল্যান্ডের শহর)কংগ্রেসে প্রুঁধো-পন্থিরা পরাজিত হয়। এখানে জমি, পরিবহন, খনি প্রভৃতিকে সামাজিকীকরণের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়, যদিও পেটি-বুর্জোয়া ভাবনা থেকে ক্ষুদ্র সম্পদের রক্ষাকারী প্রুঁধো-পন্থিরা এর বিরোধিতা করেছিল।

লিবনেখট (*Karl Liebknecht*)-এর সহায়তায় মার্কস এবং এঙ্গেলস জার্মানিতে একটি যথার্থ

২০. *Inaugural Address of the International Working Men's Association; "The First International"*

শ্রমিকশ্রেণির দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। অবশেষে তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। আস্তে আস্তে জার্মানির কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের সাথে যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৯ সালে 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। লিবনেখট আর বেবেল *(August Bebel)* ছিলেন যার প্রধান, এদের সাথে পূর্বতন পার্টি ছেড়ে আসা আরও কিছু ল্যাসালে-পন্থিও যোগদান করেন।

কিছুকাল পরেই বাকুনিন তার নৈরাজ্যবাদী দলের মাধ্যমে সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেসির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব দখল করার চেষ্টা করেন। বাসেল কংগ্রেসের পরে বাকুনিন এবং তার দল প্রকাশ্যে মার্কসের নেতৃত্বে পরিচালনাধীন সাধারণ পরিষদের *(General Council)* বিরোধীতা করা শুরু করে। তারা ল্যাসালে-পন্থি এবং উদার ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরকে মার্কসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চালিত করার চেষ্টা করে।

১৮৭০-'৭১ সালের ফরাসি-প্রুশিয়ার যুদ্ধ আন্তর্জাতিককে চরম পরীক্ষার মধ্যে ফেলে। আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলস দুই দেশের শ্রমিকদের প্রতিই আহবান জানান যে তারা যেন জাতীয়তাবাদী এবং বর্ণবাদী জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচার করে। মার্কস-এঙ্গেলস প্যারী কমিউনের (১৮৭১) বিদ্রোহীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কীভাবে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানো যায়। কিন্তু কমিউনের নেতৃত্বে থাকা প্রুঁধো-পন্থি ও ব্ল্যাংকি-পন্থিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্যারী কমিউনের এই অভিজ্ঞতাকে চমৎকারভাবে সাধারণীকরণের মাধ্যমে মার্কস তাঁর *Civil War in France* (ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ : ১৮৭১) পুস্তিকা রচনা করেন। এতে সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকের সকল সদস্যদের প্রতি আহবান আকারে কিছু নির্দেশনা হাজির করেন।

কমিউন পরাজিত হবার পর আন্তর্জাতিকের জন্য কিছুকাল ছিল চরম দুঃসময়। প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন ক্ষমতাধর, বিভিন্ন দেশের সরকার সে সময়ে নিজ নিজ দেশের আন্তর্জাতিকের নেতাদের উপর জুলুম নির্যাতনের পাশাপাশি মার্কসের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুৎসা প্রচার করতে থাকে। আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে বিরোধ চরমে পৌঁছে। বাকুনিনের পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী অনুসারীরা সর্বহারা শৃঙ্খলাবোধ, সর্বহারা দল এবং সর্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বসে – কমিউনের অভিজ্ঞতা যার গুরুত্ব দেখিয়ে দিয়ে গেছে। লন্ডন কনফারেন্সে (১৮৭১) মার্কস-এঙ্গেলস রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন। গৃহীত কর্মসূচিতে এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। বাকুনিন-পন্থিরা আন্তর্জাতিকের শৃঙ্খলাকে ভেতর থেকে নষ্ট করে দিয়ে সাধারণ পরিষদকে নিছক তথ্য আদান-প্রদানের জায়গায় পরিণত করার চেষ্টা করে। কিন্তু গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিকের আদর্শিক এবং সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে সাধারণ পরিষদের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

বাকুনিনের অনুসারীদের সাথে বিরোধ হেগ কংগ্রেসে (১৮৭২) চরমে পৌঁছায়। তীব্র মতবাদিক বিতর্কের পর লন্ডন কনফারেন্সের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সামান্য কিছু পরিবর্তনের পর আন্তর্জাতিকের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। বাকুনিন এবং তার অনুসারীদের সংহতি-বিরোধী কার্যকলাপের তদন্তের জন্য গৃহীত কমিটির প্রস্তাবনা অনুযায়ী তাদেরকে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাধারণ পরিষদের প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়।

কিন্তু প্যারী কমিউনের পরবর্তী পর্যায়ে বিপ্লব সংঘটিত হবার আর বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস, সর্বহারা বিপ্লবের দীর্ঘ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার নির্দেশনা দেন। মার্কসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ হিসেবে ভ্রান্ত আদর্শবাদকে আদর্শিক এবং সাংগঠনিক ভাবে পরাজিত করে

এবং দেশে দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের তৈরি করে তোলে, যারা সর্বহারা বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্র হিসেবে ভবিষ্যতে কাজ গড়ে তুলবে। আর এর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে। প্রথম আন্তর্জাতিক ১৮৭৬ সালে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

অনমনীয় চরিত্র এবং মর্যাদা

আন্তর্জাতিক অবলুপ্ত হলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে নেতা হিসেবে মার্কসের ভূমিকা এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। এই সময়ে প্রধান কাজ ছিলো দেশে দেশে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে এবং শ্রমজীবীশ্রেণির সচেতনতার মাত্রাকে হিসেবে রেখে সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করা। আর এজন্য সকল প্রকার বিভ্রান্ত এবং সুবিধাবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে বিরামহীন তীব্র লড়াই মার্কস তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতেও করে গিয়েছেন।

তৎকালীন স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যেমন স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং ইটালিতে বাকুনিন-পন্থি নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মার্কস এবং এঙ্গেলস তাদের প্রচারপত্র '*Alliance of Social Democracy*' (সামাজিক গণতন্ত্রীদের জোট)-তে নৈরাজ্যবাদের ক্ষতিকর ভূমিকা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। জার্মানিতে ল্যাসালে-পন্থিদের প্রভাব তখন পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এমনকি তা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টিকেও প্রভাবিত করেছিল। যার দরুণ তারা দলীয় আদর্শিক লাইনের বাইরে গিয়ে গোথা কংগ্রেসে ল্যাসালে-পন্থিদের সাথে ঐক্য করেছিল। মার্কস তাঁর '*Critique of the Gotha Programme*' (গোথা কর্মসূচির সমলোচনা : ১৮৭৫)-এ সূতীক্ষ্ম সমালোচনার মাধ্যমে গোথা কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচির স্বরূপ উন্মোচন করেন। ল্যাসালে-পন্থিদের চিন্তার বিরোধিতা করতে করতেই তিনি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসেন। এতে ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজ কেমন হবে, তার কাঠামো কীরূপ হতে পারে, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ কি – এসকল বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেন। তিনি দেখান যে সমাজতান্ত্রিক স্তরে বণ্টনের মূলনীতি হওয়া উচিত একজন ব্যক্তি যতটুকু কাজ করবে তার নিরিখে,কিন্তু "সাম্যবাদী সমাজের উপরের স্তরে যখন ব্যক্তি আর শ্রমবিভাজনের দাস থাকবে না এবং একই সাথে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটবে, যখন শ্রম শুধু জীবন ধারণের উপায় হিসেবে থাকবে না বরং জীবনের মূল চাহিদায় পরিণত হবে, ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের সাথে সাথে যখন উৎপাদিকা শক্তিরও বিকাশ হবে, সামাজিক সম্পদ যখন প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হবে – একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ সীমানা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে সমাজ এই ঘোষণার স্তরে পৌছাবে যে, "সবাই যার যার সাধ্যমতো করবে, আর যার যার প্রয়োজন মতো পাবে!" আর দীর্ঘ এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌছানোর মাঝখানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় থাকে। এই অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে রাষ্ট্র সর্বহারার একনায়কত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।"[২০]

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন ড্যুরিং একসময় 'সামাজিক ব্যবস্থা'তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি ছিলো আসলে পূর্বতন প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের একটি জগাখিচুড়ি মাত্র। জার্মানির আন্দোলনকে এরকম প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এঙ্গেলস তখন মার্কসের সাথে নিবিড় আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে 'এন্টি-ড্যুরিং' (১৮৭৮) বইটি লিখেন। সেই বইয়ের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অধ্যায়টি লিখেছিলেন মার্কস।

এমনকি জীবনের শেষ দিনগুলোতেও এঙ্গেলসের সাথে সক্রিয়ভাবে মার্কস ফ্রান্স, ইংল্যান্ড,

২০. *Karl Marx: Critique of the Gotha Programme*

আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্বহারাশ্রেণির আন্দোলনের খোঁজ-খবর রাখতেন – সবসময়ই পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন, একই সাথে ভ্রান্ত চিন্তা এবং ক্ষতিকর প্রবণতার দিকগুলো তুলে ধরতেন।

সংগ্রাম ও সংকটে অবিচল

কোনো স্বচ্ছল, আরামদায়ক জীবনের মধ্য দিয়ে মার্কসের এই সর্বব্যাপী প্রতিভা বিকশিত হয়নি বরং অভাব ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন গেছে। ১৮৫০ সালে লন্ডনের ডিন স্ট্রিটে ছোট দুই কক্ষের একটি বাসাতে তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের শুরু। সেখানে সাতজন মিলে একটি বাস কক্ষে বসবাস করতেন যা ছিল একই সাথে রান্নাঘর, পড়ার জায়গা, এবং মার্কসের কাছে আসা অতিথিদের অপ্যায়নেরও জায়গা। মার্কসের দীর্ঘ ৩৩ বছরের লন্ডন জীবনের বেশির ভাগটাই এ রকম ছোট্ট জায়গাতেই কেটেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্রিটিশ জাদুঘরের গ্রন্থাগারে তিনি তাঁর বিস্তৃত পড়ালেখা এবং গবেষণার কাজ করেছেন।

লন্ডনে বসবাস শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ট্রিয়েরের পৈত্রিক সম্পত্তি এবং তার স্ত্রী জেনির ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে যা টাকা পেয়েছিলেন তা শেষ হয়ে যায়। 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে' লেখালেখি করে অল্প যে কয়টি টাকা পেতেন সেটা ফুরাতেও সময় লাগেনি। ম্যানচেস্টার থেকে পাঠানো এঙ্গেলসের টাকাই ছিলো তাঁর জীবন নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। এই যে শুরু, তারপর থেকে মার্কসের মৃত্যু পর্যন্ত পুরো গল্পটাই ছিলো অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা, ধার দেনা, বকেয়া বিল, পাওনাদারদের তাগিদ, ঘরবাড়ির আসবাবপত্র এমনকি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস পর্যন্ত বিক্রি করা, বন্ধক রাখা, অস্বাস্থ্য, রোগ শোক, প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যু –এই সব।

কিন্তু কোনোকিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি, স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়া ঐতিহাসিক কাজ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এরকমও দিন গিয়েছে যে দিনের পর দিন বাসায় খাবার জন্য আছে শুধু রুটি আর আলু, ইংল্যান্ডের শীতের মধ্যে মার্কসের সম্বল গায়ের কোটটা পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছে, কিন্তু নবযুগের স্রষ্টা, মানবমুক্তির এই অগ্রদূত মূল কাজটি করে গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তিনি লিভারের দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণায় ভুগেছেন, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন, সারা শরীরে যন্ত্রনাদায়ক ফোঁড়া উঠেছে এবং দফায় দফায় কয়েকদিন ধরে এমন তীব্র মাথাব্যাথায় ভুগতেন – যেটা এমনকি তাঁর চোখ এবং কানের ক্ষমতাও কিছু পরিমাণ নষ্ট করে দিয়েছিল – যার ফলে তিনি কোনো কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু যত যাই হোক না কেন এই মহান সর্বহারা বিপ্লবী, বিপ্লবের জন্য তত্ত্ব এবং চর্চার কাঠামো নির্মাণে পরিশ্রম করেই গিয়েছেন, এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও তিনি লেখালেখি করে গিয়েছেন।

প্রিয়জন মারা গিয়েছে একের পর এক – ছোট মেয়ে ফ্রান্সিসকা ব্রংকাইটিসে মারা যায়, কফিনের টাকাটা পর্যন্ত জোগাড় হয়নি, একজন সহৃদয় প্রতিবেশী দিয়েছিল। তারপর মার্কসের একমাত্র ছেলে এডগার, যে ছিলো বুদ্ধিমান আর দেখতে বাবার মতন, নয় বছর বয়সে দীর্ঘদিন রোগে ভুগে বাবার কোলেই মারা যায়। কিছুদিন পর সদ্য জন্ম নেয়া মার্কসের আরেকটি বাচ্চা মারা যায়। মার্কসের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে মারা যান। মার্কসের প্রিয় মেয়ে জেনি, যে ছিলো মিসেস লংগেট, হঠাৎ করেই ১৮৮৩ সালে মারা যান। কিন্তু সর্বহারার মহান শিক্ষক, স্নেহশীল পিতা এবং প্রেমময় স্বামী, লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ সব কিছু সহ্য করে তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি – 'দাস ক্যাপিটাল'। যে ব্যাধি পুঁজিবাদী সমাজকে চারপাশ থেকে

ঘিরে আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তার স্বরূপ বের করেছেন এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে মানব সভ্যতার ভবিষ্যত অগ্রযাত্রার পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

মহাপ্রয়াণ

কিন্তু বছরের পর বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম, কষ্টকর জীবনযাপন আর মানসিক আঘাতের পরিণাম তাঁকে ভোগ করতে হলো। তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার শেষ সময়ে, মার্কস প্লুরিসি এবং ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর লোহার মতো শক্ত শরীরও ভেঙে পড়লো। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা যান। ১৭ মার্চ তাকে লন্ডনের হাইগেট কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দেয়া বক্তব্যে তাঁর আজীবন সুহৃদ ও সহযোদ্ধা এঙ্গেলস খুব অল্পকথায় মানবসভ্যতায় মার্কসের অবদান চমৎকারভাবে তুলে ধরেন :

"১৪ মার্চ, বিকেল পৌনে তিনটায়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, চিন্তাকরা থেকে বিরত হয়েছেন ... ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন, তেমনই মার্কস মানব ইতিহাস বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন ...কিন্তু এটুকুই সব নয়। মার্কস আরও আবিষ্কার করেছিলেন বর্তমানকালের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে এবং যা এই উৎপাদনব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী সেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে। তাদের নিয়ন্ত্রক চালিকা শক্তির সুনির্দিষ্ট নিয়মগুলোকে। যে সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ববর্তী সকল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন – উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে তার উপর সহসা আলোকপাত হলো। একটি গোটাজীবনের জন্য এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট...কিন্তু যেগুলোতে মার্কস মনোনিবেশ করেছিলেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই – তিনি অনেকগুলো ক্ষেত্রেই মনোনিবেশ করেছিলেন, কোনোটাতেই উপর উপর নয় – প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতেও তিনি নিজস্ব অবদান রেখেছিলেন। তিনি এরকমই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু এতকিছুও সেই আসল মানুষের অর্ধেকটাও প্রকাশ করতে পারেনা। মার্কসের জন্য বিজ্ঞান হলো একটা ঐতিহাসিক গতিশীল বৈপ্লবিক শক্তি ... আর সবকিছুর উর্ধ্বে মার্কস হলেন একজন বিপ্লববাদী মানুষ। তাঁর জীবনের মূলব্রত ছিলো এই পুঁজিবাদী সমাজকে এবং এই সমাজ যেসকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে সে-সমস্তকে উৎখাতে কোনো না কোনোভাবে অংশ নেয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, এদেরকে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজও।"[২১]

অনুকরণীয় কমিউনিস্ট চরিত্র

কোনোরকম বাধা, প্রতিকূল পরিস্থিতি, কষ্ট কিংবা অভাব তাকে তাঁর ঐতিহাসিক কাজ থেকে সরাতে পারেনি। এরকমই ছিলেন মানুষটা, এই-ই ছিলো তাঁর জীবন এবং সংগ্রাম। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচলভাবে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য অনুসরণ করে গিয়েছেন। একদিকে তিনি সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য শ্রমজীবী শ্রেণির হাতিয়ার হিসেবে বিপ্লবী আদর্শকে সুনির্দিষ্ট এবং সুতীক্ষ্ম করে তৈরি করছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাস নির্ধারিত পথে প্রতিক্রিয়াশীল ও ভ্রান্ত আদর্শকে পরাস্ত করছেন। অন্যদিকে তার পক্ষে সম্ভব এমন প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে, শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পাশাপাশি ভুল আদর্শের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। কর্মজীবনের পুরো সময়টাতেই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সাথে প্রচুর চিঠিপত্র লেখালেখির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই হোক না কেন, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে

২১. *Frederick Engels' Speech at the Grave of Karl Marx,Highgate Cemetery, London. March 17, 1883*

প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমর্থনে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ লেখার মধ্য দিয়ে তাদের পাশে এগিয়ে গিয়েছেন।

আজ বুর্জোয়ারা যখন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে চলছে, সমাজতন্ত্রকে একটি চূড়ান্ত আধিপত্যবাদী, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তখন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতার জন্য মার্কসের জীবনভর সংগ্রাম, তীব্র মতবাদিক বিতর্কের সময়ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সংযত থাকা এবং নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও মর্যাদাবোধের উন্নত দিকগুলো আবারও আলোচনায় নিয়ে আসা খুবই প্রাসঙ্গিক।

সত্যিই মার্কসের পুরো জীবনটাই শ্রমিক আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবের প্রতীক। মধ্যবিত্তশ্রেণি থেকে এসেও তিনি নিজেকে সংগ্রামের মাধ্যমে পুরোপুরি শ্রেণিচ্যুত করেছেন। জীবনের প্রথমদিকে তিনি যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় ঘুরেছেন। পরবর্তীতে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন। তিনি সম্পত্তিহীন অবস্থায় একজন সত্যিকারের সর্বহারা হিসেবে মারা যান। ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন অবস্থায় মারা যাবার মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবন দিয়েই তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, সমাজতন্ত্র হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্জিত মানবতাবাদ।

ইতিহাস মার্কসবাদের যথার্থতা প্রতিপাদন করে

মার্কসের সময়ে বিশ্বশক্তি হিসেবে পুঁজিবাদ ছিলো নতুন, গতিশীল ও বিকাশমান। কিন্তু এই বিকাশ এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সাম্রাজ্যবাদের উত্থান বা আজকের দিনে এর ক্ষয়িষ্ণু অধঃপতিত রূপ কোনোটিই তিনি দেখে যেতে পারেননি। তারপরও সে সময়েই তিনি পুঁজিবাদী সমাজের মূল দ্বন্দ্বগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে যান যে, এগুলো অনিরসনীয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এও দেখান যে, পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক অবস্থা হলো ঐতিহাসিকভাবেই ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থা যা এ সমাজের অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রেণিসংগ্রামের সর্বোচ্চ প্রকাশ পুঁজিবাদ-বিরোধী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হবে। আর এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী কাঠামোকে চিরকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বুর্জোয়াদের দাবির মূল ভিত্তিতে তিনি আঘাত করেন। আজ উপলব্ধি করা কঠিন যে এটা কতটা বিস্ময়কর একটা কাজ ছিল এবং এর জন্য কি কঠিন ও দুঃসাধ্য সংগ্রাম মার্কসকে করতে হয়েছিল। এজন্য তৎকালীন অকার্যকর ও কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে, তারই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে কিন্তু একই সঙ্গে এর সাথে একটা পরিষ্কার ছেদ ঘটিয়ে, মার্কসকে একদম প্রথম থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পুরো ধারণাটাই বিকশিত করতে হয়েছিল।

মার্কসের পর এঙ্গেলস তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী সর্বহারা আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বর্তায় লেনিনের উপর। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে এসে মার্কসবাদকে আরও সুসংহত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেন। বার্নস্টাইন, কাউটস্কিসহ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য আদর্শত্যাগী – যারা মার্কসবাদের সকল রকম বিচ্যুতির প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাদের বিরুদ্ধে লেনিন বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মার্কসবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, রক্ষা করেছেন এবং আরও বিকশিত করেছেন। আর এভাবেই মার্কসবাদ পরিণত হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদে। লেনিনের নেতৃত্বেই সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলশেভিক পার্টি পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত করে।

লেনিনের মৃত্যুর পর, লেনিনের উত্তরসূরি হিসেবে স্ট্যালিন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সশস্ত্র আগ্রাসন প্রতিরোধ করে সদ্য জন্ম নেয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ট্রটস্কি প্রমুখের আদর্শিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। শত্রুভাবাপন্ন পুঁজিবাদী দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ও নজিরবিহীন স্বল্প সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করেন; হিটলারের যুদ্ধাভিযানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সোভিয়েত অর্থনীতিকে কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে উন্নত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার সমপর্যায়ে নিয়ে আসেন। এসময়ই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণতান্ত্রিক সরকার। মহান মাও সে তুং এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় চীন বিপ্লব । কিউবা থেকে ভিয়েতনাম – পুরো পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবের ঝড়ো বাতাস বয়ে যায়।

মার্কস পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখে যেতে পারেননি। যদিও তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরও পৃথিবীর বিভিন্ন দূরবর্তী প্রান্তে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। মার্কসের সময় থেকে শুরু করে আজও বিভিন্ন ঘরানা, প্রবণতা ও ধারার সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিদ্যমান। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, এদের মধ্যে একমাত্র মার্কসবাদই সকল বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শিক দিকনির্দেশক হিসেবে সময়ের পরীক্ষায় টিকে গেল? বিজ্ঞানের জগতে এমনটা ঘটে যে একজন বিজ্ঞানী আজ যা তত্ত্বাকারে বলেন পরবর্তীতে তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। একারণে এটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ। মার্কস গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরবর্তীকালের নানান বিষয় ধরতে পেয়েছিলেন যা এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হচ্ছে।

মার্কসের সময় থেকেই বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতির আধুনিক গবেষণা আরও ব্যাপকমাত্রায় বস্তুজগতের পরিবর্তন এবং বিকাশ যে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ায় ঘটে তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা কোমর বেঁধে লেগেও মার্কসবাদের মৌলিক স্বীকার্যগুলোকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেননি।

প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতিসত্ত্বেও পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই আছে, এর প্রাথমিক নিয়মগুলো যা মার্কস আবিষ্কার করেছেন তা এখনও ক্রিয়াশীল। পুঁজিবাদীরা এখনও শ্রমশক্তি দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ফলে পুঁজিবাদ যতদিন পুঁজিবাদ রয়ে যাবে, ততদিন পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বভাবজাত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও অমীমাংসিত থেকে যাবে; শ্রমিকরা শোষিত হতে থাকবে এবং পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয় মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে থেকে যাবে। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনই এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটানোর একমাত্র ইতিহাস নির্ধারিত পথ।

মার্কসবাদঃ মানবসভ্যতার আলোকবর্তিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে মার্কসের সময় থেকেই সর্বহারা আন্দোলনের ভেতরের এবং বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শোধনবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার পরেই গৌরবময় নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের অবরোধ, বিরোধিতা এবং আক্রমণের মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংহত এবং শক্তিশালী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের প্রতিনিধি হিসেবে হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মানির বর্বরোচিত আক্রমণ শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতেই ব্যর্থ হয়নি, বরং জার্মান সমর-যন্ত্রই চুরমার হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিপ্লবের প্রবাহ পূর্ব-ইউরোপ এবং চীনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষকে পুঁজিবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আনে।

যদিও এটা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না যে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আধুনিক সংশোধনবাদীদের যে কোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপক এবং তীব্র আক্রমণ আজ এই আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আবারও একে পুনঃসমর্থন দিতে বাধ্য। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কখনই অকার্যকর হবে না, যেভাবে বিজ্ঞান অকার্যকর হয় না। যতদিন পর্যন্ত সমস্যা এবং অসঙ্গতি বিরাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কার্যকর থাকবে। সামাজিক বিকাশ নিয়মশাসিত। সমাজ স্থবির থাকে না, বরং বদলায়। কিন্তু এই পরিবর্তনও নিয়মশাসিত। কেবল আমরা যদি সঠিকভাবে এই নিয়মগুলো উপলব্ধি করতে পারি, তাহলেই আমরা সময়ের দাবি সঠিকভাবে মেটাতে পারবো। কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপলব্ধি ও তার প্রয়োগে যদি ভুল থাকে তাহলে কীভাবে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে? এটা বুঝতে হবে যে সময়ের সাথে সাথে সমস্যার চরিত্রও বদলায় আর এর যথাযথ উপলব্ধি ঘটানো সম্ভব কেবল পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ ও বিকাশের মাধ্যমেই। মার্কস-এঙ্গেলসের পর লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং এবং এদের সকলের ছাত্র হিসেবে শিবদাস ঘোষ এ কাজটি করে গেছেন।

সুতরাং, কেবল মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারবো মার্কসের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য – যা আজও অম্লান। একই সাথে মানবসভ্যতার আলোকবর্তিকা হিসাবে মার্কসবাদ আমাদের পথ দেখিয়েই যাবে।

আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলি এবং শ্রেণিসংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলবার জন্য উদ্যোগী হই, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ও সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রামে শামিল হই, যেন ইতিহাসের গতি আরও ত্বরান্বিত হয় এবং এই বিশাল সামাজিক শক্তি মুক্ত হয়ে মানবজাতি ইতিহাসনির্ধারিত পথে আরও অগ্রসর হতে পারে।

মার্কসের চিন্তাধারা দীর্ঘজীবি হোক!
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দীর্ঘজীবি হোক!
বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক!

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য কমিটি পরিচালনা কমিটি কর্তৃক
প্রকাশিত ও প্রচারিত। ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা -১০০০। ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭।
ই-মেইল : mail@spbm.org ওয়েবসাইট : spbm.org